প্রকাশিকা :
কৃষ্ণা দে বিশ্বাস
বৈশাখী প্রকাশনী
২২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ৫ই আগস্ট, ১৯৫৬

মুদ্রাকর :
শ্রীমতি জ্যোতির্ময়ী পান
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৭/১/২, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
এ. ঘোষ
১০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই—

পাঁচ মহাদেশে চলতে গিয়ে
সাত সাগর পেরিয়ে
মিসিসিপি উজিয়ে
চেরিফুলের দেশে—কুড়ি বছর আগে, কুড়ি বছর পরে
দেশ-বিদেশ
শান্তিপুর লোক্যাল
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে
মালয় থেকে মালয়েশিয়া
গভীর জলের মাছ ... ... যন্ত্রস্থ
আর এক নাগর ”
নাবিকের বেশে রাশিয়ায় ... প্রঃ অঃ
ঘুরি ফিরি সাগরে ”
গৃহপ্রবেশের রাতে ”

ঋণ স্বীকার ঃ
শ্রীদিগ্বিজয় বসু, শ্রীমলয় পাল, শ্রীনিতাই সাহা

হিমালয় সত্যি মানুষকে টানে। কাছে টানে। মানুষ তাই হন্যে হয়ে ছোটে হিমালয়ের পথে, আলপিন যেমন এক লাফে ছুটে চলে চুম্বকের দিকে। কেনই বা নয়? ছেলেবেলা থেকে সবাই যে আমরা শুনি হিমালয় লক্ষিত আশ্চর্য সব কথা—দেবতাত্মা হিমালয়, নগাধিরাজ হিমালয়, দেবনিবাস হিমালয়; তার গৌরীশিখর, মানস সরোবর, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, মন্দাকিনী, অলকানন্দা, কুবের আলয়, নন্দন কানন আরও কত কি আমরা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হই। আর মনের এক গাছি সূতো একেবারে তখন থেকেই ঐদিকে বাঁধা থাকে, কোন্-সে অলক্ষ্য নায়িকার সঙ্গে প্রেম-বন্ধনের মতো। ডানপিটে ছেলে কাঁধে রুকস্যাক বেঁধে, কানঢাকা কপাল-জোড়া হিলহিলে পশমী টুপি এঁটে, পায়ে হাইল্যাণ্ডারি বুট পরে ঘর থেকে বেরোয়—গন্তব্য হিমালয়। সংসারের সীমাহীন দায়-দায়িত্ব, দুস্তর বন্ধন, দুর্জয় বিঘ্ন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে মোহ-মুক্তিচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে হিন্দু ভাবে—বেলা যে পড়ে এলো, এবার যেতে হবে! কোথায়? হিমালয়ে। কেন? সেখানে যে দেবতারা থাকেন—দৈবাৎ যদি তাঁদের দর্শন মেলে! বুড়োরা তাদের ধনসম্পদ উইল করে দিয়ে দূরদুর্গম হিমালয়ের পথে পা বাড়ান—যদি আর ফেরা না হয়! কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কাম্বে থেকে কামরূপ পর্যন্ত সনাতন ভারতবর্ষের হিন্দু হাজার হাজার বছর ধরে একই হিমালয়ী আকর্ষণে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে এগিয়ে গেছে শান্তি-মুক্তি-মোক্ষলাভের কামনায়; যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, সবাই। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ—সে পথ ক্ষুরের প্রান্তভাগের ন্যায় অতি দুর্গম। তবু—

আমরা এই যুগের মানুষ; ক্ষুরের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগের মতো অতি দুর্গম সেই পথ অতিক্রমের সংযম এবং সাধনা এবং ধৈর্য আমাদের নেই—সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আমরা তাই হুম্ করে দুন-এক্সপ্রেসে উঠে পড়ার ফিকির করছিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন

আমাদের একটি মোহভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল—পাতাল রেল, চক্র রেল, হ্যানো রেল, ত্যানো রেলের ভবিষ্যৎ ভেবে মনে মনে ভারি বিরূপ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ যে রেলে আমরা তখন সদ্য উঠে গিয়েছি, তার অবস্থা বড়ই বেসামাল। সে দূরপাল্লার মহা মহীয়ান গাড়ি, নাম তার নাইন আপ তুন এক্সপ্রেস !

গাড়িতে ওঠার প্রশ্ন পরে, কারণ দেরাদুন ছেড়ে ভায়া লখনউ-কাশী-গয়া পনেরোশ' মাইল পথ পেরিয়ে এসে নাইন-আপ তখনও হাওড়া প্ল্যাটফরমে ঢোকে নি। লোকের ভিড়-অপেক্ষা-অধৈর্য তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে গাড়ি এসে প্ল্যাটফরমে ঢুকলে মনে হল, যেন নরকে ভূমিকম্প-অগ্নিকাণ্ড-গোলা-বর্ষণ একসঙ্গে ঘটতে শুরু করেছে। পোটলা-পুঁটলি বাক্স-পেটারা বাল-বাচ্চা নিয়ে সবার ওঠা এবং নামার সমান আকুলতা, আর যাত্রীরা সবাই প্রায় আমাদেরই মতো—দরিদ্র-অজ্ঞ-মুর্খ এবং অন্যের প্রতি নির্মমরকমে বিবেচনাহীন। বিবেচনা থাকলেও উপায় ছিল না, কারণ আর মাত্র পনেরো মিনিট পরেই গাড়ি ছাড়বে বলে ঘোষণা করা হয়েছে !

নম্বর মিলিয়ে সংরক্ষিত আসন তখন বেছে নেবার প্রশ্নই আসে না, কারণ মাল আর মালিকদের আপন আপন কামরায় উঠতে পারাটাই বড় কথা। সমস্তরকম হুড়োহুড়ি ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে মারাত্মকতম অবস্থা ছিল একটিই—গাড়িতে তখন আলো ছিল না ! কিন্তু আমরা 'হালায়' রক্তবীজের বংশ, একটি মরে মুহূর্তে একশটির আবির্ভাবের মতো তড়িৎক্ষমতায় গাড়িতে উঠে গিয়েছি। কে কোথায় বসবে, কোথায় মাল রাখবে ঠিক নেই, কিন্তু সবারই এক চিন্তা—যা-হোক করে আপন সিট দখল করতে হবে। হায় রেল, হায়রে দূরপাল্লা গাড়ির রিজার্ভেশন !

'উঃ মলাম গো' কার পেটারার কৌণিক ঘায়ে একজন যাত্রী আঁৎকে উঠতেই আর একজন ধমকায়—'চোখে দেখে চলতে পার না ?' 'আলো না থাকলে তুমিই কি আর দেখতে পার' তৃতীয়

যাত্রী জবাব দেয়। অন্তর্যামী হাসে! আলোর যখন সব চাইতে বেশি দরকার, রেলের লোক তখন যদি আলো জ্বেলে না দেয়, এমন ধারা বচসা চলতে থাকবেই। বাস-ড্রাইভার, কণ্ডাকটারদের সীমা-হীন লোভ, দুর্ব্যবহার এবং নিশ্ছিদ্র ভিড়ে ক্লিষ্ট হয়ে বাস-যাত্রীরাও অনর্থক একে অপরের প্রতি মেজাজ দেখিয়ে মারমুখী হয়। আসল সমস্যা যে কোথায় তা যারা বোঝে, তারাও তখন ভুলে যায়, দেশে ব্যাপক লোক বৃদ্ধি না ঘটলে এমন ভিড় কোথাও হত না। এই আমাদের দেশ, ছত্রিশ কোটি দেবতা, তিরিশ কোটি গরু, পঁচাত্তর কোটি লোক নিয়ে এই আমাদের ভারতবর্ষ! 'লোক বৃদ্ধি আর এখনই কোথায় দেখলেন মশায়', এক বৃদ্ধ নিজের সিট যুবক-পুত্রের কল্যাণে দখল করে বললেন—'এক বছরের মধ্যেই অবস্থাটা একবার টের পাবেন।'

নিকট ভবিষ্যতের সেই লোক-বৃদ্ধি ভীত অপর এক বৃদ্ধ বললেন—কি করে?

'তাও জানেন না,' প্রথম বক্তা বললেন—'আরব থেকে নির্দেশ এসেছে, আগামী বছরের মধ্যে ভারতে সংখ্যালঘু লোকের সংখ্যা এখনকার দ্বিগুণ করতে হবে!' সুখের বিষয় কেউ তার কথায় কান দিল না।

নামার যারা নেমে গেছে, ওঠার যারা উঠে এসেছে। আপন টর্চের আলো ফেলে তখনও অনেকে সিট খুঁজছে, মাল রাখার ফিকির দেখছে। এ যেন প্রচণ্ড কুরুক্ষেত্রের পর বেঁচে-থাকা আত্মীয়দের খুঁজে বের করার চেষ্টা! এরই মধ্যে এক বক্তা উপযুক্ত সময়ে আলো না জ্বলার কথা ভুলতে না পেরে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেন—'আলো কেন জ্বলে নি দেখে নেবো!'

'কিন্তু আলোটা কে জ্বালবে শুনি,' বর্ধমানগামী এক রেলকর্মী বললেন—'রেলের সব ডিপার্টেই লোক কম অথচ গাড়ির সংখ্যা কত বেড়ে গিয়েছে তার খবর কি আর কেউ রাখেন?' সবাই এবার উৎকর্ণ হল, গাড়ি ভেড়া এবং ছাড়ার প্রত্যাসন্ন মুহূর্তে আলো জ্বলে

নি এবং তার যে একটি বিশ্বাসযোগ্য, সমর্থনযোগ্য কারণ আছে, এবং তা ক্ষণিকের জন্য মেনে নিলেও যে মনে কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যাবে, অনেকের মনের অবস্থা তখন সেই রকম।

'গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও কিন্তু নতুন লোক নেওয়া এখন একেবারে বন্ধ,' বর্ধমানে নেমে কর্মস্থলে গমন-অভিলাষী রেলকর্মী জানিয়ে দিলেন—'গণিবাবুর হুকুম। আর দেশের যা অবস্থা,' একটুখানি দম নিয়ে ভদ্রলোক আবার বললেন—'গণিবাবুই বা কি করতে পারেন?'

রেলমন্ত্রী বরকত গণিবাবুর হুকুমের মাহাত্ম্য রেলকর্মীরা বুঝবে, তাঁর হুকুম মোতাবেক কাজ করবে, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু সমালোচকের অভাব তো দেশে নেই। এক প্রবীণ যাত্রীকে বোধহয় রেলকর্মীটির গণি-প্রশস্তির জবাবেই বলতে শোনা গেল—'মশাই, আমাদের উর্বর মস্তিষ্কে এই রকম বুদ্ধিই গজায়—লোক নিয়োগ বন্ধ কর, খরচ কমবে, দেশের আর্থিক চেহারা ফিরবে!'

'শুধু রেল কেন,' ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—'সব ডিপার্টেই এক অবস্থা। আপনার ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে আপনি আগে রোজ একশ লোক ঠেকাতেন; সেখানে পাঁচশ লোকের যদি ভিড় জমে, এবং আর কর্মী যদি না বাড়ে, তাহলে আপনার কাজ খুব নিখুঁত হবে, নাকি ব্যাঙ্কের খুব লাভ হবে, ব্যাঙ্কের কাজে লোকও খুশি হবে?'

'গাড়ি বেড়েছে, অথচ কর্মী বাড়ে নি,' প্রবীণ যাত্রী এবার মন্তব্য রাখলেন—'তবেই বুঝুন, আলো কেন জ্বলে না, গাড়ি কেন ঠিক সময়ে যাতায়াত করে না। দেশে লোক বাড়ছে, বাড়তি লোকের জন্য গাড়িও বাড়ছে। এবার বাড়তি লোক নাও, এক লোকের সংসারে অন্তত পাঁচ লোকের ভাত হবে। সোজা হিসাব।'

দেশে ব্যাপক লোকবৃদ্ধির উপর কটাক্ষ করতে ভদ্রলোক প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক আরও অনেক কথাই বললেন—'কলকাতার হকারদের কথা কখনও ভেবে দেখেছেন? ওদের সম্বন্ধে কর্তা-ব্যক্তিদের এবং অনেক পাবলিক লোকের মনোভাবটি এমন, যেহেতু

ওরা অভাবগ্রস্ত ছাপোষা মানুষ, রাস্তা থেকে ওদের হটানো ঠিক হবে না। এটা কি গরিবের আর্থিক সমস্যা মেটাবার অর্থনীতিসম্মত পথ? হকাররা তো পথ-ঘাট সবই দখল করে বসে আছে, লোক বাড়ছে, আর হকার বাড়ছে। এবার কি তাহলে আপনার বাড়ির সামনেকার ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে হকার ডেকে বলবেন—এসো, এখানে দোকান খোলো! নিশ্চয়ই না। কাজে কাজেই রাস্তায় ডাবের খোলা, আখের ছিবড়ে, লিচুর পাতা, পচা পেঁয়াজ-আনারস-আঁতা ফলের পাহাড় জমতেই থাকবে—আজ যা আছে কাল তার স্তূপ আরও বড় হবে। কারণ জঞ্জাল সবাই জমায়—পরিষ্কার কেউই করে না।'

ভাগ্যিস টর্চের আলো ফেলে আমরা সিট পেয়ে গিয়েছিলাম, এবং তিন জনের রিজার্ভ-করা সিটে তেরো জন বসেছিলাম। ঠিক এই সময়ে সহযাত্রীর বক্তৃতা ভাল লাগার কথা নয়; কিন্তু কি আর করা যাবে—কানে তো আর কুলুপ এঁটে দেওয়া যায় না। বক্তৃতা তার তখনও চলেছে—'দেশে বড্ড বেশি লোক বেড়েছে মশাই, বড্ড বেশি। এই লোকবৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। সবাই মিলে। আপনি সৎ নাগরিকের মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবেন, অন্যে একাধিক বৌয়ের গর্ভে পর পর বাচ্চা বসিয়ে যাবেন। তা কি চলে? খাস পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব মুলুকে পর্যন্ত আজ জন্ম নিয়ন্ত্রণ চলছে। 'আমাদের বেলায় ধর্মবিরুদ্ধ কি করে হয়।'

এ সব কথা আমাদের দেশে বড় কেউ চিন্তা করে না, করলে কি আর ভিখিরিদের বাচ্চা পয়দা করতে দেওয়া হত, নাকি তারা ফুটপাতে সংসার পাততে পারত। মরুক গে, আমরা যাব কেদার-বদরীতে—এ সব কথা শুনে শুনে মনকে বিক্ষিপ্ত করা ঠিক নয়। আমাদের গাড়ি হাওড়া ছেড়েছে বেশ খানিক আগে; শ্রীরামপুর; চন্দননগর, ব্যাণ্ডেল পেছনে ফেলে তুন এক্সপ্রেস এগিয়ে চলেছে। তখনও আলো জ্বলছে না। পাখা চলছে না। হঠাৎ কানে এলো—সী-তা-ভোগ। অর্থাৎ এবার আমরা বর্ধমানে। জানালার ফাঁক

দিয়ে স্টেশনের আলো এক পশলা বৃষ্টির মতো ঢুকে গেছে। মনে হচ্ছে আলোর এই সুদুর্লভ রূপ, এমন উদার দাক্ষিণ্য যেন অনেকদিন দেখি নি।

হাওড়া ছাড়ার পরই টি-টি-ই এসে টিকেট দেখছিলেন—সঙ্গে তার দু-তিনজন লোক। ভোমা টর্চ হাতে নিয়ে একজন টি-টি-ইকে সাহায্য করছিল। আশ্চর্য, এতবড় টর্চের আলো ছিল কত নিষ্প্রভ। টি-টি-ইকে শুধালাম—'আলো পাখা চলবে কি?' 'নিশ্চয়', ঝটপট তিনি জবাব দিলেন—'কি যে বলেন স্যার, এই বর্ধমানেই লোক আসবে লাইন সারতে।'

বলা বাহুল্য, সারারাত পার হয়ে গেল, পরদিনও চলে যাওয়ার পথে—আলো জ্বলা, পাখা চলার নাম নেই। গুমোট রাত, গা-ঝলসানো লু-বওয়া দিন—ভাবতেও ভয় লাগে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—বলা নেই, কওয়া নেই, সারারাত গাড়ি পথের মাঝে হঠাৎ-হঠাৎ দাঁড়িয়ে থেকেছে। অনেকক্ষণ। কি ব্যাপার? সিগনাল নেই! রেলে এটি বছর দশেকের নতুন রোগ, বেড়েই চলেছে। সারবার কিংবা সারাবার লক্ষণ নেই। ভাবুন একবার—ভূষুণ্ডির মাঠের মতো দিগন্ত-জোড়া নির্জন মাঠে, বেলে বেলে জ্যোৎস্না, আকাশ-জোড়া নৈঃশব্দ। ভূতগুলো যদি কোথাও গিয়েও থাকে, ডাকাতের হাত থেকে বাঁচব কি করে! সুখের কথা, মাঠে মাঠে বাঁশি বাজিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ গাড়ি থামলেও ভূত কিংবা ডাকাতদের শুভাগমন হয় নি। নিশ্চয় অন্য এলাকায় তাদের কাজ ছিল!

টি-টি-ইকে ঘিরে ছোট খাটো একটি জনতা দেখা যাচ্ছে। কেউ বলছে—'ব্যালান্সের দশ টাকা কিন্তু ফেরত পাই নি।' ঠিক তখনই আরেক জনের কিছু উদ্বিগ্ন কণ্ঠ কানে এল—'আপনার পরের টি-টি-ইকে কিন্তু বলে যাবেন।' ভীতু গোছের অপর এক যাত্রী প্রশ্ন করল—'রিজার্ভ-করা লোকেরা যদি বসতে না দেয়?'

টি-টি-ইকে কিছু বিব্রত দেখাচ্ছে। ভদ্রলোক তখন ঘামছিলেন। বেঁটেখাটো লোক। মিশ কালো। ভুঁড়ি আছে। পরনে শস্তা কাপড়ের

ব্যারেল-কাপ প্যান্ট, পায়ে প্যান্টের সঙ্গে বেমানান পাম-শু গায়ে কালো সিটের হাওয়াই শার্ট—তারই উপর বহুজীর্ণ বহু মলিন কালো কোট। মুখে থুথু ছিটিয়ে তার কাছে ঘুর ঘুর করা উদ্বিগ্ন যাত্রীদের টি-টি-ই বললেন—'আপনারা একবার ঐ দিকটায় আসুন তো।' সুতরাং যাদের গরজ ছিল, তারা তার পিছে পিছে ঐ দিকটায় চলে গেল।

বাঙ্কে শুয়ে তখন এক যুবতী বৌ ব্লাউজ ঠেলে উপরে তুলে ছেলেকে দুধ দিচ্ছিল। বাঁ-দিকের বুকে শোভা পাচ্ছিল রূপোর চেন—লকেটটি তার সোনার। চেন এবং লকেট ব্রেসিয়ার-স্খলিত স্তনের গায়ে এমন করে লেপ্টে ছিল যা নজরে না পড়ে যায় না; অথচ লুকোবার লক্ষণ নেই। এমন গুমোট অন্ধকারের রাত দুপুরে দুবলা টর্চের হঠাৎ-আলোর ঝিলিকে এই স-লকেট স্তনহার দেখিয়ে এবং দেখে কার কি তৃপ্তি ঘটে কে জানে!

আমাদের রিজার্ভেশন করা ছিল দু মাস আগে। এই মাত্র টি-টি-ইর পকেটে মাথাপিছু ষাট টাকা গুঁজে দিয়ে যারা অন-দি-স্পট রিজার্ভেশন পেয়েছে তারা আপন সিটে সস্নেহ দৃষ্টি ফেলে আমাদের দিকে এমন করে দেখল, যেন আমরা নির্বোধ, মিছিমিছি এত আগে লাইন দিয়ে রিজার্ভেশন করেছি! কিন্তু গোল বাঁধাল অন্য লোক, যারা আমাদের কিছু দিন পরে লাইন দিতে গিয়ে শুনতে পেয়েছিল—'সিট তো খালি নেই।' 'তখন আর কি করি', এক ক্ষুব্ধ যাত্রী বললেন—'টিকিট পিছু বাড়তি পঁচিশ টাকা দিলাম, ব্যস—নাও না কত সিট চাই!' ক্ষোভের মাত্রা তার এবার বেড়ে গিয়েছে। 'রহস্যটা এবার বুঝুন, 'আমাদেরই সাক্ষী করে ভদ্রলোক বললেন—'বাড়তি টাকায় বিকিয়েও কিছু সিট হাতে রাখা ছিল—এখন সুযোগ বুঝে ষাট টাকা আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু এখানেই কি শেষ', ভদ্রলোক এবার রেলের বিরুদ্ধে আরও তীব্রতর অভিযোগ খাড়া করে বললেন—'এই লম্বা কামরায় কমপক্ষে একশ জন বে-রিজার্ভেশনের লোক আছে—মাথা পিছু দশ টাকা নিয়ে টি-টি-ই

এদের এই কামরায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করতেই তারা বলে দিলে।'

কে এক নিদারুণ উত্তেজিত যাত্রী চিৎকার করে উঠল—কোথায় টি-টি-ই, ডাকো শা—

সঙ্গে সঙ্গে কথা ভেসে এলো আরেক জনের—'সে কি আর কাছে পিঠে আছে মশাই। কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।'

'ভাবুন এবার', আমাদের প্রবীণ সহযাত্রী এবার মুখ খুললেন—'কার ঝাড়ে কে বাঁশ কাটে—আমাদের সিটের অধিকার কে কাকে বেচে। এ যে পুলিশী কারবার মশাই,' তিনি কারবারটি এবার খুলেই বললেন—'প্রত্যেকের কান মুচড়ে পয়সা নিয়েই তো পুলিশের লোক হকারদের দোকান খুলতে দেয়। রাস্তায়, ফুটপাতে, কোথায় নয়। ভাড়া দাও, দোকান কর। অথচ রাস্তার মালিক পুলিশ নয়।'

'কিন্তু রেলে কেন এমন হবে,' প্রবীণ ভদ্রলোক এবার বলতে লাগলেন—'ভিড় বেশি? তা হলে মশাই আরও রেল বানাও, বগী বানাও, এঞ্জিন তৈয়ার কর; নতুন নতুন রেল লাইন খুলে দাও। পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে রেলের নতুন নতুন লাইন খুলে দেশকে জালের মতো ঢেকে দাও। সব বেকারের ভাত হবে, আমরাও আরাম করে গাড়ি চড়ব। এত গাড়ি চললে সিট তো এমনিতেই খালি পড়ে থাকবে। রিজার্ভেশনের দরকারই হবে না।'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে। দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদের জন্য রেডিও চালু করতেই শোনা গেল—'খবর পড়ছি ইভা নাগ। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, দেশের আর্থিক অবস্থা এখন অনেক ভাল···রেলমন্ত্রী শ্রীগণিখান চৌধুরী হাওড়া-তমলুক হাওড়া-ডোমজুর, মালদা-বালুরঘাটে নতুন রেল লাইন খুলতে উঠে পড়ে লেগেছেন।' ইত্যাদি।

একজন ছোকরা যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল—'বলেছিলাম না, গণিদার মতো লোক হয় না।'

তা হলে রিজার্ভেশন নিয়ে এত কেলেঙ্কারিতে তাঁর নজর নেই কেন? রেলে সিগনাল নেই কেন, আলো নেই কেন, গাড়ি খালি লেটে চলে কেন?' কেউ জবাব দিল না।

আধঘণ্টা আগে আলো জ্বলতে শুরু করেছিল, কামরায় পাখাও ঘুরছিল। এবার দপ করে আলো নিভে গেল। পাখা বন্ধ হল। বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল।

* * *

যা-হোক-করে রেল-ভ্রমণ চুকিয়ে এসেছি। এবার আমরা হরিদ্বারে। একটি নামী আশ্রম দেখতে গিয়ে তো আমি অবাক। সাধুদের মধ্যে দুটো দল, রাজনৈতিক দলের লোকের মতো সবাই বিবাদমান। প্রায় সবার মধ্যেই প্রচণ্ড স্বার্থপরতা প্রকট, শিষ্যের দানে ঘি-দুধ-দই কিনে অনেকেই উদরপূর্তিতে ব্যস্ত। অনেকেরই ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত একাউণ্টে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকাও আছে। দেখতে পাচ্ছি আশ্রমের খাবার খেয়ে কেউই তৃপ্ত নয়। শরীরটা বাঁচাতে হবে তো, এক মধ্যবয়সী সাধু মুখ মুছতে মুছতে বললেন—'দোকানে গিয়ে গরম রসগোল্লা খেয়ে এলুম।'

হরিদ্বারে সাধু-সন্ত খুব বেশি। তাদের জীবনধারা কেমন, সাধন ভজন কতটা করেন, ভগবানের ডাকে আন্তরিকতা কতটুকু, কি করে সারাদিন কাটে ইত্যাদি নিয়ে আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। প্রথমেই কিন্তু কিছু ধাক্কা খেতে হল। একজন স্পষ্ট বক্তা, আপাতদাম্ভিক, একটু-খিটখিটে এবং সম্ভবত উচ্চকোটির সাধুর সঙ্গে কথা হল। আশ্রমে নাকি তার কথা তেমন কেউ শোনে না, তেমন কেউ তাকে মানেও না—প্রায় সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দাড়ির গৌরবে তার মুখের আদল খানিক রবীন্দ্রনাথের মতো। সাধুজীর দোষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা এই, ব্যাঙ্কে তার কোনো মালকড়ি নেই—তাছাড়া সাধুগিরির গৌরবের ছটায় অ-সাধুদের চোখ তিনি ঝলসে দিতে পারেন নি। ব্যক্তিগত শিষ্য তার নেই বললেই চলে। সুতরাং শিষ্য যাদের আছে, স্বভাবতই তারা তাকে

খাটো চোখে ভাখেন। এ যেন সংসারের চক্রপিষ্ট বালুর ঘানি—চোখ-বাঁধা বলদের দল নিরুপায় নিষ্ঠায় চারদিকে ঘুরছে!

এহেন সাধুসঙ্গর বদলে গঙ্গার ধার আমার ভাল লেগে গেল! লোকে কথায় বলে—হরিদ্বারের গঙ্গা। অনেক তার নাম। সেদিন ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমার বিকেলবেলা—লক্ষ লোক গঙ্গায় নেমে পুণ্যস্নান করছেন। পুরুতের কাছে পাইকারি হারে মন্ত্র পড়ে সবাই গঙ্গার জল স্পর্শ করছেন ফুলের অঞ্জলি নিয়ে। তারপর দেয় ডুব। খুঁটির পর খুঁটিতে মেলাই চেন বাঁধা আছে। এই চেন শক্ত হাতে ধরে গঙ্গাস্নান সারতে হয়, নইলে দুর্বার স্রোতে কে কোথায় ভেসে যাবে তার ঠিক নেই। গঙ্গায় কি স্রোত, কি ভিড়! মোটা ভুঁড়ি নিয়ে ধবধবে ফর্সা মাড়োয়ারী মেয়ে পুরুষ চেন-হাতে যখন চান করেন, তখন যে দেখবার মতো দৃশ্য হয়, তার প্রমাণ থাকে ওদের দিকে তামিসগিরি মানুষের হাজার জোড়া চোখের দৃষ্টিপাত।

কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত এক সাহেবের বাচ্চা নগ্নপায়ে উদলা গায়ে কেবলই হেঁটে বেড়াচ্ছে—কি তার উদ্দেশ্য কেউ জানে না, জানাব চেষ্টাও করে না। আমি কথা বলতে চেষ্টা করতেই সাহেবটা এড়িয়ে গেল। একথা বারবার আমাদের উল্লেখ করতে হয়েছে, পোশাকের স্বল্পতার জন্য এদেশে লজ্জার বালাই ওদের মোটে নেই। সঙ্কোচ তো নেই-ই। কারণ ওরা বুঝে নিয়েছে, ইণ্ডিয়া ঘুরতে দেহে এক ফালি বস্ত্রের আভাস থাকলেই হল, ভাল পোশাক পরার দরকারই নেই; কারণ এ নিয়ে এ দেশের কেউ কিছু বলেও না, ভাবেও না সাহেব ছোকরারা তাই ছেঁড়া গেঞ্জী, নোংরা পাজামা, শস্তা চপ্পল পরে। মেম ছুঁড়িরা পরে ময়লা জিন-প্যাণ্ট, নয়তো তিন কোয়ার্টার পাজামা, কিংম্বা শুধু সায়া। গায়েতে বাসি কুর্তা, নয়তো ব্রেসিয়ারহীন ব্লাউজ—বুকের মধ্যে কাঁচা কাঁটাল হল ঢল করে। ওদের ভ্রুক্ষেপ নেই।

তপন মিত্র খিদিরপুরের ছাওয়াল, বাড়ির কাছেই গঙ্গা; কিন্তু সে-গঙ্গায় মাছের ঝাঁক কখনও দেখতেই পায়নি। বছর কয়েক

আগে হ'রিদ্বারে এসে তপনকুমার হর-কি-পিয়ারির ঘাটের কাছে ছ্যাঁতলা-পরা বাঁধে বিস্তর শোল মাছ দেখে গিয়েছিল। তখন নাকি মানুষের হাত থেকে হাঁ করে আটার গুলি নিয়ে গিলে খেয়ে মাছে মহানন্দে পুচ্ছ নাচাতো; শরৎবাবুর গল্পে কার্তিক গণেশ নামে রুই দুটোর মতো যখন-তখন ভেসে উঠে দেখা দিত। সে সব মাছ নাকি কিছুদিন আগে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। জলের অভাবে। গঙ্গায় বাঁধ বাঁধতে গিয়ে মানুষ জল টেনে নিয়ে ডাঙা করে দিয়েছিল, ফলে মাছরা মরে ভূত। সেই সব মৃত মৎস্য দেখে একমাত্র বাঙ্গালির ছাড়া কারও মনে নাকি দুঃখ হয় নি। আসলে বাঙ্গালির দুঃখও মাছের জন্য নয়, নিজের জন্য—মরা মাছগুলো উঠিয়ে নিয়ে যেতে না পারার দুঃখ, কারণ, নিতে গেলেই লোকে কানাকানি করবে, খোঁচা মেরে বলবে—হেই মাছখেকো বোঙ্গালি। এই সব কাহানি যিনি আমাদের বলেছিলেন তিনি আবার বাঙ্গালি নন—তিনি নাকি বেশ দেখতে পাচ্ছিলেন, বেওয়ারিশ মাছগুলোর কথায় আমাদের জিহ্বায় জল এসে গিয়েছে। তপন কিছু ক্ষ্যাপাটে ছেলে; রেগেমেগে সে শুনিয়ে দিল—খাওয়ার জিনিসের কথায় জিহ্বায় যদি জল এসেই যায়, তাহলে কার পিতৃদেবের কি।

হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে অনেক মন্দির রয়েছে—গঙ্গামন্দির, কৃষ্ণ-মন্দির, শঙ্কর ভগবানের মন্দির। ভক্তরা ফুল কিনে জলে ছেড়ে দিয়ে স্নান সেরে নিচ্ছে আর ভাবছে, খুব ধর্ম হল, বেদম পুণ্য অর্জন হল। পুণ্যকামীদের অনুপাতে ভিখিরি অনেক কম মনে হচ্ছে। কারণ খুঁজে বেড়াবার দরকার হয় না—কাছেই বাসমতি চালের ভাত রেঁধে বিতরণ হচ্ছে; ভিক্ষা করার দরকারটি কোথায়! পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে লোকে লুচি হালুয়া পর্যন্ত গরু বাছুরকে খাইয়ে দিয়ে প্রণাম করছে, মাথায় এবং পায়ে ফুল দিচ্ছে। গরুরা কিন্তু সে ফুল খেয়ে ফেলছে!

সমর সজ্জায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র হর-কি-পেয়ারির ঘাটে শুভ্র মূর্তিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐখান থেকে যতো দীপ ভাসিয়ে

দেওয়া হচ্ছে। ভাসন্ত প্রদীপে গঙ্গার জল একাকার—মনে হচ্ছে যেন আজ দীপাবলী উৎসব। ভিড় ঠেলে পুলের উপর উঠে আসা রীতিমতো কঠিন কাজ। একাধিক বাচ্চা আগলিয়ে মায়েরা কি করে যে এগোচ্ছে ভাবা যায় না।

উত্তরপ্রদেশ ভারতের সব চাইতে বড় রাজ্য, ভারতের অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ উত্তরপ্রদেশে—অযোধ্যা, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী সবই সেখানে। অলকানন্দা, মন্দাকিনীও উত্তরপ্রদেশের নদী। বেদ-বেদান্ত-পুরাণ সব কিছু লেখা হয়েছে উত্তর প্রদেশের মাটিতে। আধুনিক যুগেও উত্তরপ্রদেশের গৌরব কিছু কম নয়—এ পর্যন্ত ভারতের সব প্রধানমন্ত্রীই উত্তরপ্রদেশের লোক। ধন্য উত্তরপ্রদেশ, ধন্য ভাইয়ারা।

হরিদ্বারের কাছে গঙ্গা হিমালয়ী ভাগীরথীর মতো ক্ষীণতনু না হলেও অপ্রসরই বলা চলে। নিচে নেমে গিয়ে ফুলে ফেঁপেই গঙ্গা বড় নদী। বিহার, উত্তরপ্রদেশ নির্মমভাবে গঙ্গার জল টেনে নিয়ে ব্যাপক চাষের আয়োজন করছে, অথচ বাংলাদেশের যতো ঝগড়া, যতো রাগ অভিমান পশ্চিমবাংলার সঙ্গে, যতো শত্রু আমরা। অথচ জলের অভাবে কলকাতা মরতে বসেছে। গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি ভারতে। 'জলদানে মহাবদান্য ভারত সরকারের কোন কার্পণ্য আছে মনে হয় না,' হরিদ্বারের নদী-বিজ্ঞানী হরকিষণজী বললেন—'কিন্তু এই নদীগুলির উৎস এবং গতিপথের বেশির ভাগ যদি পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হত, আমরা কতটা জল পেতাম, কিংবা আদৌ পেতাম কিনা কে জানে—আন্তর্জাতিক আইন কানুন যাই বলুক না কেন।'

কিন্তু এসব হচ্ছে রাজনীতির কথা। অশান্তির কথা। তার চাইতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও—ক্ষণিকের জন্য হলেও মনে বৈরাগ্য আসবে। টায় টায় সন্ধ্যা এবার ঘনিয়ে এসেছে—পদ্মপাতার নৌকোয় ফুল রেখে তার উপর মোমবাতি বসিয়ে নৌকোগুলো ভাসিয়ে দিয়ে প্রদীপ্ত মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখছে কত দূর

যায়; অনেক দূরে গেলে ভেবে খুশি হয়, তার পরমায়ুর জোর আছে। নদীর পাঁকে চক্রে পড়ে দীপ নিভলে নৌকো ডুবলে তার মন খারাপ হয়ে যায়—এ যে দিন ঘনিয়ে আসার অলক্ষণ! কিন্তু পবিত্র গঙ্গায় ফুল ছিটিয়ে মানত করা পুজো সেরে ওরা যদি মোক্ষ লাভের কথা ভাবত, গঙ্গাজলের ধারার সঙ্গে যদি মিলিয়ে দিতে পারত পরমার্থ চিন্তা। তা হলে তো কথাই ছিল না। পদ্মপাতার নৌকো ডুবি দেখে, এ-যে বড় সাধারণ চিন্তা, দেবতাকে সাক্ষী করে কুসংস্কারের কাছে মাথা পেতে দিয়ে আপন আসন্ন মৃত্যু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো!

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—টাকার জোর যার যতো বেশি, পদ্মপাতার নৌকো তার তত বড়; ফুল ধরে তাতে অনেক বেশি, মোমবাতি থাকে গোটা পাঁচেক, মাঝখানে থাকে একটি পদ্মফুল। এ হচ্ছে গঙ্গা পূজার এক নতুন স্টাইল, পুরুৎ-পাণ্ডা-প্রসাদের ব্যবস্থা না রেখে। ওদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে অদূরে; হাতে ওদের হীরের আংটি, বৌয়ের গলায় মুক্তোর মালা। কিন্তু খুব বড় পদ্মপাতায় তৈরী বড় নৌকোয় বেশি ফুল সাজিয়ে বড় বড় দীপ জেলে ভাসিয়ে দিলেই যে গঙ্গা মাইজী ওদের লম্বা পরমায়ুর গ্যারান্টি দেবেন তাই কি আর বলা যায়!

কলকাতার এক ভদ্রলোক তার বৌ, ছেলে আর দুটি মেয়ে নিয়ে সব আচার অনুষ্ঠান যথাযোগ্য পালন করে ফুল ভাসিয়ে দিলেন। 'কেন তা তো জানি না,' ভদ্রলোক বললেন—'সবাই ভাসায়, আমিও তাই ভাসিয়ে দিলাম। আমাদের কথাবার্তা মেয়ে দুটোর কানে যায় নি। তারা বলাবলি করছিল—বেশ দেখাচ্ছে মাইরি! ঠিক তখন দুটো বাঙ্গালি ছেলে পদ্মপাতার নৌকোয় ফুল আর প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে ধ্বনি দিল—গঙ্গা মাই কি জয়! এবার যেন মনে হচ্ছে, এখানে যতো লোক ফুল আর প্রদীপ ভাসায়, তার বেশির ভাগই বাঙ্গালি!

বাঙ্গালি আর বাঙ্গালীপনা দেখবেন তো চলে আসুন হরিদ্বারের গঙ্গার ধার বরাবর বাজারের দিকে। মোতি বাজারে। হ্যাঁ, নামটি

বাংলায় এমনি করেই লেখা রয়েছে। আবীরের মতো রুপ্রে ঢালাও সিঁন্দুর বিক্রী হচ্ছে—আয়োজনটি যেন বাঙ্গালির জন্যই বেশি। খাট্টা দই, মিঠা দই চাই? পাবেন। রসগোল্লা, সন্দেশ রাবড়ি? অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে—রাবড়ি আঠাশ টাকা, সন্দেশ চব্বিশ টাকা, রসগোল্লা দশ টাকা কিলো। বঙ্গভূমির সব শহর গাঁয়ের পর ভারতে হরিদ্বারই বোধ হয় একমাত্র জায়গা, যেখানে এতো বাংলা মিষ্টি তৈরী হয়। বিক্রী হয়। লোকে খেয়ে সাবাড় করে।

তীর্থযাত্রীরা কেদার-বদরী যাবেন—উঠছেন এসে ভারত সেবাশ্রমে, কালী-কম্‌লিতে, ভোলাগিরি ধরমশালায়। ফিরে এসেও তাই। ভোলাগিরির কাছেই রয়েছে দিদির হোটেল, দাদা-বৌদির হোটেল, মাসিমার হোটেল—সব পাড়াতো এবং পাতানো দিদি, দাদা-বৌদি, মাসি; যতো সব হিসেবী লোক—তীর্থযাত্রী তালিকায় বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশি দেখে হোটেল খুলেছিলেন। ভালই জমিয়ে নিয়েছেন। যে কোন একটিতে গিয়ে খেতে বসুন—বাসমতি চালের ভাত, এক চামচ ঘি, ডাল, বেগুন কিংবা আলু ভাজা, পাঁপড় ভাজা, দুটো সব্জী, চাটনি—যতো খুশ খান, কেউ কিছু বলবে না। পেটচুক্তি ব্যবস্থা। মাত্র পাঁচ টাকায়। মাছ মাংস চাইলেই বিপদ—কেউ দিতে পারবে না। খালিপিলি মুখ নষ্ট। কেউ চায়ই না।

হরিদ্বারে বেশ তো খেলাম, গঙ্গার ধারে ঘুরলাম, সপ্তঋষি আশ্রম থেকে কনখল পর্যন্ত দেখে বেড়ালাম। বড্ড গরম, এই যা—গা মাথা জ্বলে যায়। সপ্তঋষি আশ্রমে যেতে ভারত মাতার মন্দির পড়ে আগে। সবাই তো ভালই বলে। ইন্দিরা গান্ধীর উদ্বোধন করা ভারত মাতার মন্দিরে অনেক দেব-দেবী, অনেক সাধু মহাত্মার মূর্তি আছে; বাঙ্গালিই আছেন চারজন—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষ। এক বঙ্গসন্ন্যাসী কঠোর সমালোচনা করে কিন্তু বললেন—'ভাবী কালে চমক সৃষ্টির মতো কি আছে ঐ দুকোটি টাকায় নির্মিত মন্দিরে—না কোন চোখ-ধাঁধানো স্থাপত্যভাস্কর্য, না কোন শিল্প-সৌন্দর্য!

এবার আমাদের এগিয়ে যেতে হবে উপরের দিকে—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার-বদরীর দিকে। তারপর ঘুরে ফিরে আবার এই-খানে—এখানে যাত্রার শুরু, এইখানে যাত্রার শেষ। তাই নাকি সঙ্গত বিধি। অলিখিত নিয়ম। এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে।

অন্য পথই বা কোথায়!

* * *

হরিদ্বার হয়ে ঋষিকেশে এসে গরম দেখে তো অবাক। সাগর পৃষ্ঠের হাজার ফুট উপরে ঋষিকেশের অবস্থান; ওপারে বনশ্রেণী-মণ্ডিত সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী হিমালয়ের ছোট শাবকটির মতো হাতছানি দিচ্ছে। এখানে কি আর এতটা গরম আশা করা যায়? কাছেই আবার পবিত্র গঙ্গা তর্ তর্ করে বয়ে চলেছেন। 'ঋষিকেশের গঙ্গা মনে আছে,' বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—'যেখানে দশ হাত গভীর জলে মাছের পাখ্না গোণা যায়।' কিন্তু গঙ্গার সেই গাঙ্গং বারি মনোহারী রূপ আর এখন কোথায়—জল এখন আবিল আর হিমশীতল, স্রোত দুর্বার; মাছেরা যে মহানন্দে পুচ্ছ নাচিয়ে চলে তার কোন চিহ্নই নেই। আর মৎস্যসন্ধানী লোকই বা কোথায়? এমন নিরিমিষ্যি দেশে প্রকাশ্যে তো মাছ ধরা এবং খাওয়ার কোন উপায় নেই। পৃথিবীতে এ হচ্ছে অদ্বিতীয় উদাহরণ—নদীর জলে মাছ আছে, কিন্তু কেউ ধরতে পারে না! কোন আইন নেই, তবু এই হচ্ছে অলিখিত নিয়ম। কিংবা কানুন!

ঋষিকেশে লুকিয়ে যারা বিয়ার খায়, বোতলগুলো কাউকে দেখতে না দিয়ে ডুবিয়ে রাখে গঙ্গার জলে, বরফ শীতল জলে ঠাণ্ডা করে গোপনে তুলে নিয়ে যায়—পয়সা খরচা করে ফ্রিজ রাখার দরকারই হয় না। গঙ্গার ধারে দুধভরা এন্তার ড্রামও জলে ভাসে, বিশেষ করে গীতা মন্দিরের কাছে। ছোট মোটর বোট খুব বড় সোরগোল তুলে সেখানে যাত্রী ওঠায়, যাত্রী নামায়—ড্রামগুলো কেউই লোপাট করার কথা ভাবে না; আর ভেবেও লাভ নেই, কারণ শক্ত খুঁটিতে ভাসন্ত ড্রামগুলো কায়দা করে বাঁধা। ঠিক হরিদ্বারের

মতো। তার উপর আবার কোন্ অলক্ষ্যে কে নজর রাখে কে জানে! দুগ্ধ সংরক্ষণের এমন উপায় কেউ আর কোথায় দেখেছেন? বোধ হয় না।

গীতা মন্দিরে দেয়ালের পর দেয়াল জুড়ে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কাহিনী নানা চিত্রকর্মে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তারই একটিতে দেখা যাচ্ছে, হিমালয়শীর্ষে একটি ধবলী গাই দাঁড়িয়ে আছে; তার বাঁট থেকে নির্গত দুধের ধারা গিরিনির্ঝরিণীর স্রোতে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে গঙ্গার রূপ নিয়েছে। ভগীরথের পথ দেখানো গঙ্গার মর্তে অবতরণের সঙ্গে এর মিল নেই।

গঙ্গার ধার বরাবর এগিয়ে গীতা মন্দির থেকে তিন কিলোমিটার পথ চলে আসুন ইউক্যালিপ আর আমবনের মধ্য দিয়ে। সামনে লছমন ঝোলা, লক্ষ্মণের নাকি তপস্যাস্থল—নিচে গঙ্গার খরস্রোত বইছে। হিমালয় জুড়ে রামায়ণ কাহিনীর সম্পর্ক কম—ভগবান শিবের পর মহাভারতের মহামুনি, মহামানবের কথার প্রাধান্যই সেখানে বেশি রয়েছে।

ভারতের অন্য অনেক শহরের মতোই ঋষিকেশের হালচাল অসংলগ্ন, মেজাজ ঢিলেঢালা, দর্শন অনাকর্ষক—এখানেও গরুরা নিঃশঙ্ক পথচারী, রাস্তাঘাট নোংরা, লোকের দৃষ্টিভঙ্গি সেকেলে। কলকাতার সঙ্গে ঋষিকেশের অল্প কিছু তফাত আছে—জঞ্জালের স্তূপ এখানে আকাশ-ছোঁয়া নয়, আখের ছিবড়ে আম-আনারসের চোকলা আর পাতায় শিয়ালদহের মতো নরক সৃষ্টি হয় না। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার-বদরী—এই চারোধাম অভিমুখে বাস ঋষিকেশ থেকে ছাড়ে বলে যাত্রী সমাগম এখানে অঢেল, বাস আর হোটেল ব্যবসা রমরমা, ধর্মশালার ছড়াছড়ি। গোপাল কুঠির মতো আধুনিক ধরমশালায় এন্তার আলো-হাওয়া-জল—একটা বড় ঘর রোজ মাত্র আট টাকা ভাড়ায় নিয়ে দিব্যি চারজনে থাকা যায়। পাঁচ টাকায় যে খাওয়া হোটেলে মেলে তা গুণেগৌরবে হরিদ্বারের খানার মতই। মাছ মাংস? ওসব কথা বলতে গেলে বিপদ আছে!

ঋষিকেশেও নামমাত্র পোশাক পরে ইউরোপ আমেরিকার ছাওয়াল মাইয়ারা ঘুরে বেড়ায়; লজ্জা-শরমের বালাই নেই। আপন আপন দেশে ওরা কোট-প্যাণ্ট-টাই পরে, ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ ডিনারে রুটি-মাখন-চীজ, শোর-গরু-মুরগী কত কিছু খায়; বীয়ার খায়, হুইস্কি গেলে। ভারতে এলেই ওদের কিছু দিব্যজ্ঞান জন্মে, সেটি হচ্ছে এই—এখানে ডাল-ভাত খেয়ে লেংটি পরে যেখানে সেখানে মাথা গুঁজে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। পোশাক সম্বন্ধে ওরা মাঝে মাঝে এমন উদাসীন বৈরাগ্য দেখায়, যা আমাদেরও লজ্জা দেয়। খাওয়া সম্বন্ধে সব খুঁতখুঁতি ওরা সাগরের জলে ফেলে দিয়ে আসে। ডাল-ভাত খেয়ে ভারতীয়রা যদি শরীর ধারণ করতে পারে, আমরা কেন নয়—ইত্যাকার দিব্যজ্ঞান-প্রাসাদাৎ সাহেব মেমগুলোও তাই খায়। দেখে অবাক লাগে, ওরা আমাদের চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, আরও কম খরচে ভারত ভ্রমণ করে। এদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। এবং শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ কিতাব লেখে, কারণ লেখার মজাদার মালমশল্লা, ইনশে আল্লা এখানে অনেক মেলে। 'এই তো সেদিনের কথা', নরওয়েজিয়ান যুবক লারসেন বলল—'খিদিরপুরের রাস্তায় বাস চাপা পড়ে একটি ছেলে মরল। মুসলমান। আর যায় কোথা—মুসলমানরা মিছিল বের করে বলে কি, ইচ্ছা করে মুসলমান হত্যা করা হয়েছে!'

'তুমি কি করে জানলে?' আমি পুছ করি।

'বারে' লারসেন জানায়—'আমি যে তখন খিদিরপুরেই থাকতাম। আমার স্টকে এমন অনেক মজাদার গল্প আছে—সব সত্য ঘটনার কথা। লিখলে হট কেকের মতো বিকোবে।'

ওদের আমি যতো ভ্রষ্টাচারী ভেবেছিলাম, মিথ্যা গল্প ছেপে ভারতের অপনাম ঘটায় মনে করেছিলাম, ঠিক ততটা ধূর্ত আর কপট ওরা নয়। আমাদের অবস্থা এবং সমস্যা বুঝে নেবার ইচ্ছা বা আগ্রহ বা চেষ্টা অনেকেরই আছে দেখতে পাচ্ছি। ভারতে যা ওরা চোখের সামনে দেখে, তাই নিয়েই লেখে—অবশ্য তার মধ্যে নিজের মতামত

যোগ করে। অন্তত লারসেন, ডবসন, ভন মুলারের কথা শুনে আমার তাই মনে হয়েছে। ভারতে চার বিবি ফরজ, ভন মুলার বলে—কথাটি শুনে আমার খটকা লাগে—সত্যি সবার কি চারটে করে বৌ থাকে? কৈ, রাস্তাঘাটে লক্ষ্য করলে তো তা মনে হয় না। সত্য সন্ধানে উঠে পড়ে লেগে গিয়ে জানতে পারলাম, সে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। ইস্, চোখ টিপে হেসে ভন মুলার বলে—'তোমাদের সোনার দেশ। এখানে জন্মালে—'

ওর বৌ ফস করে পুছ করল—'কি বলছ গা?'

ভন মুলার বলল—'ভারতে জন্মালে চারটে বিয়ে করতে পারতাম!'

হাত মুঠি করে ধরে কটা চোখে তাকিয়ে ওর বৌ বললে—'মারব গাট্টা!'

কিন্তু কলকাতা সম্বন্ধে ভন মুলার আমাকে যে সব কথা বলেছিল তার প্রতিবাদ করতে কোন কিছুই আমি খুঁজে পাইনি। কেদার বদরীর পথে রওনা হবার আগে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে ভন মুলার মুখ খুলতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই বৌ এসে বলল—'হানি, চল আমরা খেতে যাই।'

রোজা অবশ্য জার্মান ভাষায় কথাটা বলেছিল, ভন মুলার আমাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিয়ে বলল—'চল এখন খেয়েই নেওয়া যাক। কলকাতা সম্বন্ধে আমার মতামত পরে জানাব। ভন মুলার তার কথা রেখেছিল। সে সব কথা বারান্তরে বলতে হবে বৈ কি!

ঋষিকেশ ছাড়ার পর কম-উচ্চ পাহাড় পর্বতের ধাপে ধাপে বাস চালিয়ে আমরা অনেক উপরে উঠে এসেছি। কঠিন পাথর কেটে কেটে তৈরী করা পথ, খুব সঙ্কীর্ণ—নিচে সুগভীর খদ। চোখ মেলে ওদিকে চাইলে মাথা ঘুরতে থাকে, ভয় হয়, বাস সোজা গিয়ে খদে পড়ে যদি! অথচ এই সঙ্কীর্ণ সরু পথ তৈরী করতে যে মনোযোগ, দক্ষতা, শ্রমের প্রয়োজন পড়েছিল, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে, কিছু স্বতঃগ্রথিত মর্মন্তুদ কাহিনী আছে; তার সব কথা আমরা

জানি না। আমাদের জন্য যারা পথ রচনা করে গিয়েছিল তাদের কথা আমরা ভাবিও না।

আমার পাশে বসে আছে মোহন সিং; টিহরি গাড়োয়ালের লোক, থাকে দিল্লীতে। ব্যবসা করে। বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে বসবাস করে। পাঁচ বছর পর মোহন সিং এবার দেশে যাচ্ছে ভাইঝির বিয়ে দিতে; হিমালয় কোলে এক গণ্ডগ্রামে। মোহন সিং-এর চার বাচ্চা শুনে আমি ওর চোখে চোখ রেখে তাকালাম। তার অর্থ বুঝতে পেরে মোহন সিং বলল—'ভগমান দিয়েছেন।' আমি বললাম—. 'এবার অপারেশন করে নাও না ক্যানে?' 'খোদার উঁপর খোদ-গারি করব বাবু।' মোহন সিং অবাক হয়ে বলে।

হিমালয়ে আমার অন্যতম সঙ্গী শাস্তারাম লিঙ্গম্ অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। চড়াই পথে গাড়িতে বসে সে প্রকৃতির যতো সব অচিন্তনীয় রূপ দেখে নি, বিমূঢ় হয়ে ভাবেনি, বাস খদে পড়ে গেলে কি হবে—মনের শান্তিও তার বিঘ্নিত হয়নি।

রামলিঙ্গম্ না জানে হিন্দী, না বাংলা। ভাগ্যিস আমাদের সব কথা ও বোঝে না, সব উদ্বেগের সমভাগী হয় না। পথপাশে গভীর খদ দেখে ওর মনে কোন চিন্তা আদৌ এসেছিল, কিংবা পড়ে গেলে গুঁড়িয়ে যাবে ভেবেছিল কে জানে। আমাদের কথাবার্তায় এ পর্যন্ত মাত্র একবারই রামলিঙ্গম্ অংশ গ্রহণ করেছে।—কলকাতায় রিজার্ভেশন নিয়ে যে সব কাণ্ড-কারখানা চলে সেই প্রসঙ্গে বললাম—, 'তোমাদের মাদ্রাজেও কি এসব চলে নাকি।' 'ইল্লা স্যার', রামলিঙ্গম্ বলল—'ইল্লা, ইল্লা' অর্থাৎ না মশাই, না—মাদ্রাজে ওসবের বালাই নেই।

পাহাড়ের পথে এগিয়ে যেতে অজস্র আম গাছ দেখা যাচ্ছে—গাছে গাছে বিস্তর আমের কড়া। সারা মার্চেও এদিকে শীতের প্রকোপ ছিল বলে এপ্রিলের ওম গায়ে লাগিয়ে গাছ মুকুল ফুটিয়েছে। সুতরাং মে মাসের প্রথমে গুঁটি বাঁধবে, সে তো সোজা হিসাব!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অজস্র ধানসিঁড়িও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে তৈরী সিঁড়ির মতো সব আবাদী জমি—ওতে ধান-গম যখন জন্মে, ওগুলোকে ধানসিঁড়ি বলতে আর বাধা কোথায়! জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি অঞ্চলে প্রথম দেখেছিলাম পাহাড় জোড়া ধান-সিঁড়ি, মোটে দেড়-দু ফুট চওড়া। ধান ছাড়া সেখানে কিছুই হয় না। হিমালয়ের পাহাড় কাটা জমি-গুলো বেশ চওড়াই বলতে হবে। তবু ওগুলোকে আমরা ধান-সিঁড়ি বলেই উল্লেখ করব।

গঙ্গার ধারা পাশে পাশে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। দুদিকে ভোমা ভোমা খাড়া পাহাড়ের ভূমিতল ঘসটে সঙ্কীর্ণ খাদে দুর্বার বেগে গঙ্গা এগিয়ে চলেছেন ঋষিকেশ-কাশী-কলকাতার দিকে। বঙ্গোপসাগরের দিকে। আমরা এগোচ্ছি উজানে। হিমালয় জুড়ে অতি সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম পথগুলো যখন বাঁক নেয়, তখন মনে হয় জীবনের বোধহয় এক বিশেষ মুহূর্ত এসে গেছে। হয়তো মাত্র শ গজ পথ অতিক্রম করতে হবে—তার জন্য বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে সর্পিল ছন্দে এগিয়ে পিছিয়ে অনেক সময় দশ মাইল পর্যন্ত পার হয়ে যেতে হয়। আর তখন যদি পাহাড়ী বনভূমে ফুলের হাসি, হাজার ফুট নিচে কলনাদিনী নদী, অপ্রসর আবাদী জমি পাহাড়ের গায়ে চোখে পড়ে, কি ভালই না লাগে। এইসব বাঁক ঘুরতে ড্রাইভারের কৃতিত্ব মানতেই হয়। তার মনোযোগ কত নিবিড়, চোখের দৃষ্টি কত গভীর, গাড়ির চক্রচালনায় দক্ষতা কত নির্ভুল হলে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়! বাঁক ঘুরতে তার হিসেবে একটু ভুল হলেই পাহাড়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে মরতে হবে। এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়—সামনে গাড়ি চোখে পড়লেই ড্রাইভার আপন গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়, একে অপরকে সন্তর্পণে জায়গা ছাড়ে, পরস্পরে সেলাম বিনিময় করে। কুশল শুধায়। অর্থাৎ দেশের উল্টোটা—কে কাকে রাস্তা ছাড়ে, খালি তো খিস্তি খেউড়!—

এইমাত্র বাঁক ঘুরে চারদিকের বনভূমে মন-আকর্ষক গন্ধ পাচ্ছি—

ইউক্যালিপটাস গাছের ঘন অরণ্য থেকে ইউক্যালিপ তেলের গন্ধ আসছে। ঋষিকেশ ছাড়ার পর এ পর্যন্ত নব্বুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা হয়েছে। পাশ দিয়ে গঙ্গা আপন মেজাজে ভাঁটির দিকে বয়ে চলেছেন। এবার বাস এসে থেমেছে বেশ খানিক প্রশস্ত জমিতে। এখানে দোকান-পশার, হোটেল-স্টল সবই আছে। বেশ কিছু বাস এখানে আগুপিছু করতে পারে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এ জায়গার নাম টিহরি গাড়োয়াল।

দেরাদুন, পৌরি, চামৌলি, টিহরি, উত্তরকাশী—এই পাঁচটি জেলা নিয়ে গাড়োয়াল মণ্ডল—পৌরি তার হেড কোয়ার্টাস। মণ্ডল-প্রধানকে বলে কমিশনার। কমিশনারি কোর্ট-কাছারি পৌরিতে। ভূতপুর্ব একজন কমিশনারের কথা গাড়োয়ালীরা বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে—নাম তাঁর কুমারী কুসুমলতা মিতল। যোগ্যতায় দক্ষতায় শিষ্টাচারে লোকের মনে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। আরও এক গাড়োয়াল প্রশাসিকার কথা এখনও সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁর নাম মিসেস জ্যোতি পাণ্ডে। তিনি ছিলেন পৌরির জেলা শাসক। ভারি জবরদস্ত। পশ্চিম বাংলার মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট রাণু ঘোষ একই সঙ্গে স্মরণীয় একটি নাম।

টিহরি জেলার এক গাড়োয়াল ছাওয়াল পশ্চিম বাংলায় জেলা শাসক ছিলেন—একজন আই-এ-এস ছোকরীর সঙ্গে তিনি নাকি ফেঁসে যান। বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক হয়ে যায়। হঠাৎ তখন প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক বিবাহিত। আই-এ-এস মহিলা ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে গালমন্দ করেন। ভদ্রলোক গলায় দড়ি দিয়ে মরে বাঁচেন। ঘটনাটি ফাঁস করতে নিষেধ করে উত্তরকাশী বনবিভাগের এক বয়স্ক অফিসার বললেন—'বুঝলেন তো, এর সঙ্গে সমগ্র গাড়োয়ালের মর্যাদা জড়িয়ে আছে।'

আমি কিন্তু ঠিক বুঝলাম না।

টিহরির ছোট্ট হোটেলে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম—

বাসমতি চালের ভাত, তুর দাল (অড়হর), আলু-টমাটোয় ঝোল; বাড়তি পয়সায় কিছু খট্টা দই। দইয়ের দাম? হোটেলওয়ালা বলল—আট টাকা কিলো। আড়াইশ গ্রামের দাম দিয়ে যে পরিমাণ দই মিলল তা একশ গ্রামের বেশি নয়। 'প্লেটচুক্তি দাম দুটাকা', পয়সা হাতে নিয়ে হোটেল ম্যানেজার বলল—'ঐ আমাদের আড়াইশ গ্রাম।' এরা টিহরির লোক নয়; নিচে থেকে সব নিচতা, লোক ঠকানো সব টেকনিক সঙ্গে করে নিয়ে এসে ব্যবসা খুলেছে।

এখন আমরা পনেরো শ ফুট উঁচুতে, কিন্তু ঠাণ্ডার নাম নেই—প্রচণ্ড গরম পায়ে পায়ে ফিরছে। ঋষিকেশের পর এ পর্যন্ত নব্বুই কিলোমিটার উঠে এসেছি—প্রায় সবটা রাস্তাই বৃটিশ আমলে তৈরী হয়েছিল। আরও উপরে এগিয়ে যাবার জন্য দেহের শিরা-উপশিরার মতো অজস্র পাথর কাটা পাকা পথ তৈরী হয়েছে। দুর দুর্গম হিমালয় অনেক সুগম হয়েছে। তার কৃতিত্ব স্বাধীন ভারত সরকারের। এই কৃতিত্ব অনেক; ছিদ্রান্বেষী বিশ্বনিন্দুকদের ডেকে কিন্তু বেশ বলা যায়—যাও, একবার গিয়ে দেখে এসো!

টিহরি থেকে যমুনোত্রী যাবেন? ঋষিকেশ থেকে ভায়া টিহরি ধারাসু পর্যন্ত এসে বাঁদিকে যমুনোত্রীর পথ ২১১ কিলোমিটার। ডাইনের পথ গঙ্গোত্রীর—উত্তরকাশী হয়ে ২১৮ কিলোমিটার পথের শেষে গঙ্গোত্রীর উপকণ্ঠ। সেখান থেকে আবার তিন কিমির চড়াই উৎরাই। তারপর গঙ্গোত্রী।

গঙ্গাকে চোখে চোখে রেখে পাহাড়ী পথে এগিয়ে চলেছিলাম। সুবিশাল দুই পাহাড়ের পাদমূলে গঙ্গা দেখে আমার নায়গারার কথা মনে পড়ছে। প্রপাত ঘটবার আগে নায়গারা আসলে একটি নদী—আমি দেখেছিলাম একেবারে উৎসমুখে, ইরি হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে। নায়গারার তীর কংক্রিট কঠিন, খাজ-কাটা, পোড়মাটি রঙের। তীর থেকে একশ ছিয়াত্তর ফুট নিচে কালচে সবুজ জল। কোন নদীর তীর যে এত খাড়া হয়, গোটা একশ ছিয়াত্তর ফুটের তীর এবং

তীরবর্তী জমির প্রতি ইঞ্চি যে এমন কঠিন পাথরে তৈরী হতে পারে, সে কথা ভাবাই যায় না।

গঙ্গার জলধারা বইছে চারপাঁচশ ফুট নিচে, তীরভূমি কিন্তু এক ফুটের বেশি খাড়া মনেই হচ্ছে না। গঙ্গার দুদিকে দুই পাহাড়ে প্রাকৃতিক লীলা বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। আমগাছের ডালে বসে কোকিল ডাকছে মিহিসুরে—কু-উ, কু-উ, কু-উ। পাহাড়ের গা বেয়ে দুর্বার বেগে ঝরণাধারা নেমে আসছে। গাছে গাছে কিছু বিচিত্র জিনিস চোখে পড়ছে—আগার দিকে কাণ্ডে খড় জড়িয়ে রাখা হয়েছে। শীতের শুরুতে জাপানেও অনেক গাছ ধান খড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়—কিন্তু সে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত। দুনিয়ার পোকামাকড় এসে তাতে বাসা বাঁধে। বসন্তের শুরুতে ধান খড়গুলি গাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়—পোকা মারার এ এক জবর কায়দা! হিমালয়ে গাছে গাছে খড়ের গাদা মুড়ে দেওয়া হয় অন্য কারণে, গাছের গোড়া ছায়াময় রাখতে, জলীয়াংশ শোষণ থেকে কিছু বাঁচাতে। তাছাড়া চাষীদের বাড়িঘর দূরে দূরে। পাহাড়-এলাকা বলে বাড়িতে জায়গাও কম—সেখানে বয়ে নিয়ে যায় কোন্ নির্বোধ। তার চেয়ে বরং মাঠে কাজের শেষে খড়বিচুলি খাইয়ে গরুমোষ ঘরে নিয়ে যাও!

যাত্রীদের অনেকেই এবার বমি করে করে হেউ ঢেউ। আমার পাশে একজন গাড়োয়ালী লোক পর্যন্ত অনবরত বমি করে কেমন যেন একটা মোহনিদ্রার আবেশে অবশ হয়ে পড়ে আছে। এমন অবস্থা তো হয় দোলনের সাগরে। অবশ্য সাগর মহাসাগর আর গিরিরাজ হিমালয়ের বিরাটত্ব তো একই রকমের—সেখানে যে আমরা বড় অসহায়।

গঙ্গাকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। রাস্তার সঙ্কীর্ণতা মারাত্মক রকমে চোখে পড়ছে। বাসের চাকা যে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে তার মাত্র ফুট খানেক পরই গভীর খদ শুরু হয়েছে অর্থাৎ গাড়ি চালনায় একটুখানি অমনোযোগী হলেই গাড়ি খদে পড়ে যেতে পারে।

যাত্রীরা এই অবস্থা লক্ষ্য করে দেখছে, আর চোখ বুজে মনে মনে খুব সাবধান হচ্ছে—যেন আমি চোখ বুজে থাকলে আমার শত্রু আর আমাকে দেখতে পাবে না। ভগবানে ভক্তি এখানে সবারই লক্ষ্য করার মতো, পরম ভক্তের মতো মুহুর্মুহু সবাই ভগবানকে ডাকছে—ঠাকুর গাড়ি যেন খদে না পড়ে, প্রাণ নিয়ে যেন ঘরে ফিরতে পারি!

দেখতে পাচ্ছি যাত্রীদলে বাঙ্গালিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রকমে বেশি। ভ্রমণে এবং তীর্থযাত্রায় শতকরা পঞ্চাশ জনই বঙ্গসন্তান, আর পঞ্চাশজন বাকি ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মিলিত লোক। আজও। এবং সর্বত্র। পাহাড়-সাগর কিংবা নদী পর্বত, মথুরা-মায়া-দ্বারাবতী কাশী-কাঞ্চী-অযোধ্যা, কিংবা পুরী-বৃন্দাবন-কুরুক্ষেত্রের তীর্থ, অথবা রাজগীর-রাজপুতনা-ইলোরা-অজন্তা—সব জায়গায় বাঙ্গালি সবার পুরোভাগে। তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডারা, পথে বিপথে খেদমদ করা লোকেরা—তাই বাংলায় না গিয়ে বাংলা ইস্কুলে না পড়ে, শুধু তীর্থের বাঙ্গালির সঙ্গে মিশেই দিব্যি বাংলায় কথাবার্তা বলতে শেখে—তাই তো দেখছি। পৃথিবীতে সব চাইতে ঘুরুক্কু জাত বলে আমেরিকানদের নাম আছে। তবে মনে হয় না তুলনায় বাঙ্গালি কিছু কম ঘুরুক্কু। তবু তার ঘরকুনো হবার বদনাম। চাকুরি নিয়ে দূরে যেতে চায় না যে!

ধারাসুর পর গঙ্গার বদলে যমুনাজীকে চোখে চোখে রেখে এগিয়ে চলেছি—এখন যেন আমরা তার খাস তালুকের প্রজা। যমুনা দেখেই যাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে বলে—জয় যমুনাজীকি জয়! আমরা যে যমুনার উৎস সন্ধানেই চলেছি—এবার তার জয়গান না করলে চলে! কিন্তু কেউ বলে না দিলে বুঝবার উপায় ছিল না এটা যমুনা, ওটা গঙ্গা।—দুই-ই তো পাহাড়ের পাদমূল বিধৌত করে উপলবিষম পথে একই ছন্দে একই রকম ক্ষীণতনু নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। গঙ্গা-জলে আছে বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ; তবে শান্তিবারিধারায় ভস্মশাপগ্রস্তরা মুক্তি পায়। গঙ্গা খুব বড় ঘরের বড় মেয়ে—পৃথিবীর বৃহত্তম এবং মহত্তম পর্বত হিমালয়ের কোলে তার জন্ম; মহাসাগরে তার বিলয়।

একই হিমালয়ে জন্ম নিয়ে যমুনা শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় মিশে আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। স্বল্প দৈর্ঘের জীবনে যমুনা আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। যমুনার জলে আছে প্রেমের স্পর্শ। আজও নাকি যমুনার তীরে রাখাল রাজা শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজায়—ভরা বেদনায় মিলন বাঁশরি বাজে নীল যমুনায়। কৃষ্ণপ্রেমিক নদী দেখেই শ্রীযমুনা ভাবে। সমাধিস্থ হয়। যমুনার এই মাহাত্ম্য, এই সুর-ছন্দ-রেশ বৃন্দাবন থেকে যমুনোত্রী পর্যন্ত আজও তাই মানুষের মনকে মাতিয়ে রাখে।

এবার যেন অনেকটা প্রশস্ত পথে এগিয়ে চলেছি, চোখ মেলে সেই মারাত্মক খদ আর দেখা যাচ্ছে না। প্রশস্ত ঢালে দেওদার বন ঘন হয়ে আসছে। বাস ঢালে যদিও পড়ে যায়, গড়িয়ে একদম হাজার ফুট নিচে চলে যাবে না—পথপাশের দেওদার গাছে বাধা পেয়ে আটকে থাকবে। মৃত্যুর আশঙ্কা ক্ষণকালের জন্য হলেও মানুষের মন থেকে চলে গিয়েছে, এখন আর কেউ ভগবানকে ডেকে বলছে না—বাঁচাও! প্রথম দর্শনেই জয়ধ্বনি করে নিয়েছিল—এবার যে যার চিন্তায় মগ্ন।

আমরা এখন যমুনোত্রী থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আছি। তিনখণ্ড সুবিশাল পাহাড়ের নিম্নতম ঢালে যমুনাজী ত্রিধারায় বয়ে চলেছেন। জল স্বচ্ছ নীল। স্রোত দুর্বার। যমুনার কূলে কূলে বেশ প্রশস্ত কিছু আবাদী জমিও রয়েছে। ওপারে যাবার জন্য একটি পুল দেখতে পাচ্ছি। এখানে দাঁড়িয়ে ছিপ ফেলে যে লোকে মাছ ধরে তার প্রমাণও দেখা যাচ্ছে। এর উজানে আর মাছ নেই।

মাছের কথায় তীর্থযাত্রী বাঙ্গালিরা খানিক উন্মনা হয়ে পড়েছে এবং অনেকে তা লক্ষ্য করছে; মনে মনে বোধ হয় বলছে—বাঙ্গালি বটে তো! আমরা যে বাঙ্গালি বাসের সবাই মোটামুটি জেনে ফেলেছে। কাউকে বলতে হয় না, মুখ খুললে সবাই বোঝে আমরা বাঙ্গালি—সারা ভারতেই শুধু নয়, মোটামুটি সারা পৃথিবীতেই আমাদের উচ্চারণ শুনেই লোকে বলে—ও, আপনি বাঙ্গালি!

টিহ্‌রি গাড়োয়ালের পর সোয়া শ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এবার আমরা হনুমান চটিতে পৌঁছে গিয়েছি। সন্ধ্যা এখন সাড়ে সাতটা—আহার বাসস্থানের গরজ এখন বড় গরজ। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়পুঞ্জের মাঝখানে হনুমান চটি, বেশ কিছু সমতলী জমি নিয়ে একটি প্রশস্ত চত্বর। গোটাকত বাস আগেই এসে ভিড়ে রয়েছে। হনুমান চটিতে গোটা আটেক ধরমশালা আছে। আমাদের আগে যারা এসেছে তারা নিশ্চয় আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। সবার গন্তব্য যমুনোত্রী, আরও বারো কি-মি উপরে; বিশ্রীরকম চড়াই-পথের শেষে। এখানে পৌঁছাবার আগেই বরফমণ্ডিত হিমালয়ের শুভ্র চূড়া দেখতে পেয়েছিলাম। এখন বেশ শীত বোধ হচ্ছে। তাতে আর বিচিত্র কি!

আমরা স্থান করে নিয়েছি আনন্দভবনের দ্বিতলে। আনন্দভবন কাঠের বাড়ি, আশপাশের অন্য সব ধরমশালার তুলনায় কিছু ভদ্র গোছের। তবু পেছনে কাঠের নড়বড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে ভয় লাগে, মনে হয় প্রায় ঘর-সংলগ্ন যমুনার ঘন গর্জনের জোরে এখনই পাটাতন-করা বারান্দাটা তো বটেই, হয়তো গোটা বাড়িটাই ঝর ঝর করে ভেঙে পড়বে। আর তখন উন্মত্ত খরস্রোতে তুমড়িয়ে মোচড়িয়ে কোথায় যে ভেসে যেতে হবে তার ঠিক নেই।

সামনের দিকে সংলগ্ন চালা ঘরটিও আনন্দভবনের সম্পত্তি—ছ' মাসের মরসুমী মেয়াদে ভাড়া নিয়ে হোটেল-কাম-ধরমশালা খুলেছে বেহারের একটি লোক। 'কি আর করব, ছ'মাসে ছ'হাজার টাকা ভাড়াই গুণতে হয়', হোটেলওয়ালা বলল—'বরফ পড়ে মরসুম বন্ধ হলেই তালা লাগিয়ে নিচে চলে যাই; ছ'মাস পর মরসুম শুরু হতেই আবার এসে তালা খুলি। আয় রোজগারের কথা বলছেন তো? চলে যায় আর কি।' আমরা কিন্তু শুনেছি খুব ভালই চলে!

আনন্দভবনের মালিক জয় সিং পাণ্ডোয়ার পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা করে কাঠে আর টিনে ধরমশালাটি তৈরী করিয়েছেন। রোজ

আট টাকা ভাড়ায় দ্বিতলে একটা ঘর নিয়ে আমরা শোওয়ার ব্যবস্থা করলাম। লেপ তোষকের ভাড়া স্বতন্ত্র—তোষক ভাড়া রোজ এক টাকা, লেপ দুটাকা খাওয়া নিচের হোটেলে, কিংবা যখন-যেখানে-খুশি। নিচের হোটেলওয়ালাও তার চালা ঘরে জনকুড়ি যাত্রী রেখে শোওয়ার ভাড়া আদায় করে। সস্তা রেটে। ভিড় বাড়লে ওখানেই কি আর সিট মেলে! হোটেলে খাওয়া বলতে ভাত আর চাপাতি, তুর দাল, সামান্য সবজী। সব চীজ এখানে দারুণ মাঙ্গা—বাসি ভিণ্ডী ছ'টাকা কিলো, বিবর্ণ উচ্ছে ছ'টাকা, লকলকে লাউ পাঁচ টাকা, পালং শাক চার টাকা, খাওয়ার অযোগ্য টমাটো ছ' টাকা কিলো। আসল সবজী হচ্ছে আলু, ঘন অন্ধকার রাতে একটুখানি আলোর মতো। হোটেলের খাওয়া বেশ সস্তাই বলতে হয়। পেটচুক্তি মোটে চার টাকা। এখানকার জীবনের উৎস নিচে; নিচে থেকে চাল, ডাল, সবজী আসে, লোক আসে, ঘরবাড়ি বানাবার মালমশল্লা আসে। নিচে বলতে অপেক্ষাকৃত সমতলের দিক—হনুমান চটিতে বসে 'নিচে' বললে টিহরি গাড়োয়াল কিংবা ঋষিকেশ বুঝায়। আন্দামানেও এইরকম একটি কথা চালু আছে, পোর্ট ব্লেয়ার শহরের বাইরে গাঁয়ের দিকে কেউ গেলেই বলে —জঙ্গলে গেছে, তা যতো কাছের বা যতো দূরের যতো উন্নত জনপদই হোক না কেন!

হনুমান চটির আশপাশে নিত্য জীবনের চেহারাটা অনেকটা এইরকম—ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে! কিন্তু খাওয়া-শোওয়া বাদেও তো সকালবেলায় প্রাতঃকৃত্যাদির একটি প্রশ্ন আছে। যার সমাধানও যত্রতত্র—পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে মাঠ করতে বসে যাও না ক্যানে, কেউ ফিরেও তাকাবে না!

এখানে জলের ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। পাহাড়ী ঝরণার তো আর অভাব নেই—ঝরণা ধারায় পাইপ যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, পাইপের পথে রাতদিন জল এসে পড়ছে হনুমান চটিতে। টলটলে বরফ শীতল জল—যতো খুশি নিয়ে খাও, রান্না কর, হাত মুখ ধোও। অনেক

ঝরণাতে চাকি বসানো আছে, তাতে দিব্যি গম পেষাই চলছে। হনুমান গঙ্গা এসে যমুনায় পড়ছে বলে যমুনাজী এখানে আরও উত্তরোল, আরও খরস্রোতা। জানকী চটির কাছে যমুনাতেও চাকি বসানো আছে। সেখানে পেষাই হচ্ছে চোওলি আর গম।

আনন্দভবনের সামনে ছোটখাটো একটি ভিড় দেখা যাচ্ছে। কাছেই হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছে কানফাটা আওয়াজ করে। চালাঘরের হোটেলে পাতা-বেঞ্চে দুই হাতে দুই গাল আর কান ঢেকে মনমরা হয়ে বসে আছে ভন মুলার আর ভরযুবতী রোজা, তার ভ্রমণ-সঙ্গিনী। কাছের কাঠের উনুনে চাপাতি সেঁকা হচ্ছে। ডাল ফুটছে।—উপবাসক্লিষ্ট মানুষের সামনে সে যেন এক মচ্ছোবের ফলার! খাওয়ার চাইতে আগুনের কাছে বসে থাকার আকর্ষণই আপাতত বেশি—নিদারুণ শীতের মধ্যে উনুনের ধারে বসে খাওয়ার সুযোগ পাওয়াও কি কম কথা! পাহাড়ী পথে সারাটা দিনে বাসের মধ্যে যে ধকল গেছে, তাতে মনে কারও স্ফূর্তি থাকার কথা নয়—এবার খাওয়ার পাট চুকিয়ে লেপের তলে যেতে হবে।

ভন মুলারের কাচুমাচু মুখ দেখে ভাবলাম, নিশ্চয় ওর দেশের কথা মনে পড়েছে। জার্মান সীমান্তে ওদের আধুনিক ঘরবাড়িতে থাকা খাওয়ার নিশ্চিন্ত আরামের কথা কি আর এখন মনে না এসে পারে! কোথায় রাইনল্যাণ্ডের বহুবাঞ্ছিত ওয়াইন, গরম গরম সসেজ ভাজা, রোস্ট-বীফ-ফ্রেঞ্চ পটাটো, অঢেল মাখনপ্রলিপ্ত হোম-মেড কালো পাঁউরুটি, আর কোথায় সপ্তম শতাব্দীসুলভ হিমালয়ী পান্থশালায় কাঠের উনুনের পাশে বসে ডাল আর সেঁকা রুটির আশ্বাস! বললাম—দেশের কথা ভাবছ বুঝি?

ভন মুলার স্মিত হাসল, যেন কিছুই ঘটেনি তেমন করে বলল—'নাঃ—তবে কিনা, তোমাদের গানগুলো বড্ড বেশি জোরে বাজে। সইতে পারি না।'

বেচারা ভন মুলার! আমি আর কি বলতে পারি—জোরে গান বাজলে আমি নিজেই তো কানে আঙুল দেই। আশ্চর্য, গানের

মতো করে গান আমরা শুনি না, শুনতে চাই না। তা যতো ভদ্র, যতো শিক্ষিত আমরা হই না কেন। আমাদের ঘরে ঘরে রেডিও কিংবা টিভি বাজে সপ্তমে চড়ে—গান হোক, বাজনা হোক, খবর হোক—সব। এবং ভারতের সর্বত্র। তাতে অন্যের কি অসুবিধা হয় তা ভাবতে আমাদের বয়ে গেছে! ভাবটা তাই!

বাঁ হাতে চাপাতি রেখে ডান হাতে ছিঁড়ে ডালের বাটিতে ডুবিয়ে ওরা মুখে ফেলছিল; তার সঙ্গে ঝোল-ঝাড়া আলু। বেশ জুতসই করে চিবুচ্ছিল। গরম কড়া থেকে সরাসরি পাতে পড়ছিল আলুর ঝোল আর ডাল। আর গরম গরম চাপাতি। কাছে বসে হাতে ভাত তুলে খেতে খেতে আমি বললাম—'আমাদের এই সব খাবার ভাল লাগছে?'

'কেন, বেশ তো। বেশ ভাল!'

'ডাল তরকারি খেতে ঝাল লাগছে না?'

'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'যাই বলো, আমাদের বড় গরিবী বন্দোবস্ত। সস্তা।'

'মাত্র চার টাকায় এর চাইতে ভাল কিছু তো আশা করিনি।'

'থাকার ব্যবস্থার কথা নিশ্চয় জেনে নিয়েছ। অন্যের ব্যবহার করা ভাড়া-নেওয়া লেপ তোষকে শুতে পারবে তো?'

'তোমরা পারবে তো?' ভন মুলার উল্টে আমাকে প্রশ্ন করে বলল—'তাহলে আমরা কেন পারব না!'

ভন মুলার মৃদু মৃদু হাসছে।ছোঁয়াচে রোগের মতো ভন মুলারের হাসি রোজাকে সব সময়ই স্পর্শ করে—ইংরেজী কইতে, আলাপে অংশ নিতে পারে না বলে মুখের হাসিতে সে সব কিছু পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কাঠের আগুনের ওম গায়ে মেখে হালকা কথায় বেশ সময় কাটছিল। দেশের কার্পেট পাতা ঘরে ফায়ার প্লেসের আরামের কথা হয়তো ওদের মনে পড়ছে, কিংবা এই মুহূর্তে ক্ষুধার অন্ন ছাড়া কোন কথাই ওরা ভাবছে না। খাওয়া এবার শেষ হওয়ার পথে।

'রোজার দাঁতগুলো ভারি সুন্দর' আমি হাত গুটিয়ে বসে কথা

প্রসঙ্গে মন্তব্য করি। ভন মুলার জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে। রোজা হাসে।

'মুখখানা ওর বাঙ্গালি মেয়ের মতো' আবার আমি বলি। রোজা ড্যাব ড্যাব করে তাকায়।

'গায়ের রঙেও বেশ ট্যান হয়ে এসেছে'—আমার তৃতীয় মন্তব্যে রোজা সোজা হয়ে বসে। শীতের দেশের মেয়ের পক্ষে চামড়া ট্যান হয়ে আসাটা মস্ত এক মর্যাদার কথা; তাতে রূপ-খ্যাতির মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হয়। রোজা চোখ তুলে এবার এমন করে তাকায় যেন গদগদ কণ্ঠে বাংলায় বলবে—ঠিক বলছ!

এবার ভন মুলারকে আমি শুধালাম একটি গুরুতর প্রশ্ন—'হঠাৎ যমুনোত্রী দেখতে তোমরা ক্ষেপে উঠলে কেন?'

'বারে', ভন মুলার অবাক হয়ে বলে—'মস্ত বড় তীর্থস্থান—ওখানে যাব না!'

আমি ততোধিক অবাক হই। ভন মুলার এই মুহূর্তে এমন করে কথা বলছে, যেন হিন্দুর তীর্থ ওর তীর্থ; সুদূর অস্ট্রিয়া থেকে তীর্থযাত্রা করে হিমালয়ে এসে যমুনোত্রী দর্শন করতে পারলে যেন জীবনের মস্ত একটি স্বপ্ন সার্থক হয়। এবার একটুখানি বাঁকা মন্তব্যে ভন মুলার বলে—'হিন্দুর তীর্থকে খেরেস্তানের পক্ষে তীর্থ বলে মানতে বাধা কোথায়? খেস্টানের জেরুসালেম, মুসলমানের মক্কাকেও তো হিন্দুরা তীর্থস্থান বলেই ভাবে। তাতেই বা দোষ কোথায়?'

অকাট্য যুক্তি!

ভন মুলার দশবছর আগে প্রথম ভারতে এসেছিল। ভারতের আজগুবি আচার-নিষ্ঠা, সাপ খেলা, রোপ-ট্রিকের পথ-চলতি তামাসা দেখায় সেদিন ছিল তার আকর্ষণ। এবার নাকি তার তীর্থযাত্রা।

অস্ট্রিয়া-জার্মান সীমান্তের এক পল্লীপ্রান্তে ভন মুলারের বাড়ি। সেখানে তার একটি সরাইখানা আছে। অস্ট্রিয়ায় ভ্রমণরত তাবৎ বিশ্ববাসীকে ভন মুলার সেই পল্লীপ্রান্তের সরাইখানায় স্থান দেয়।

খেদমদ করে।—সেই তার সখের পেশা। রোজা তার সহকারিণী এবং চব্বিশ ঘণ্টার সহকার্মিণী। সে তার গাঁয়ের মেয়ে। 'এমনি পাহাড়ময় জায়গায় আমার ঘর', ভনমুলার জানায়—'এমনি চড়াই-উতরাই তার পথ। পাহাড়ের ঢালে ঢালে চিরহরিৎ বন। তবে সব ব্যবস্থা আমাদের আশ্চর্য রকমের আধুনিক, এই যা।'

ভন মুলারের কথায় তার জন্মভূমির পাহাড়ে প্রান্তরে, বনস্থলীতে যেন কবিতা আছে, এই মুহূর্তে যেন তাকে গৃহকাতর মনে হচ্ছে—দেশের স্মৃতি যেন তার মনকে বিভোর করে তুলেছে। 'ভারতবর্ষের অনেকেই আমার পান্থশালায় পদধূলি দেয়', ভন মুলার হঠাৎ আবার কথা কয়ে ওঠে—'একটি গুজরাতি পরিবারের কথা তোমাকে বলছি। একেবারে আন্তর্জাতিক পরিবার।'

'কি রকম', আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করি—'গুজরাতি, আবার আন্তর্জাতিক—কথাটা যে সোনার পাথরের বাটি হয়ে গেল।'

ভন মুলার স্মিত হেসে বলে—'ওদের কেউ থাকে ভিয়েনায়, কেউ লণ্ডনে, কেউ নিউইয়র্কে—বেশির ভাগ বোম্বেতে। তা হলে ওদের কি বলবে', ভন মুলার এবার আমাকেই জিজ্ঞেস করে—'আন্তর্জাতিক নয় কি!'

আমিও অতশত ভেবে না দেখার জন্য বোকার মত হাসি এবং ভন মুলার দেখছি তা বেশ উপভোগ করছে! 'প্রত্যেক বছরের শেষ দিকে একবার বোম্বে-লণ্ডন-নিউইয়র্ক থেকে সবাই এসে আমার পান্থশালায় জোটে,' ভন মুলার এবার মোক্ষম কথা বলে—'রাইনের লাল মদ খায়, টেনিস খেলে, স্কী করে। পারিবারিক মিলনে সময়টা ওদের কাটে ভাল।'

'ভিয়েনা তো আমার বাড়ির কাছেই,' ভন মুলার আবার জানায়—'ভিয়েনার গুজরাতিরা আমার ওখানে গিয়ে উঠে যখন তখন—বছরের শেষ দিকে তো বটেই।'

'তাঁরাই কি তোমাকে ভারতে তীর্থ দর্শনের প্রেরণা যুগিয়েছেন?'

'না, তাদের মতো আমিও হিন্দু না, ইহুদী না, খেস্টান না—

আমি একজন বিবেকবান মানুষ। আমি এসেছি আপন অন্তরের প্রেরণায়, তীর্থ দর্শনের মন নিয়ে। পথ চলা আমার সখ। আমার অভ্যাস।'

আমি বলি—তোফা বলেছ বন্ধু!

আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবনে যমুনা বয়ে চলেছেন; লক্ষ লক্ষ লোকের নিত্যদর্শন ঘটছে। তবু সবাই ছুটে আসে যমুনার উৎস দেখতে। সেই উৎসকে বলে যমুনোত্রী। ওখানে যমুনাজীর মন্দির আছে, গরম জলের কুণ্ড আছে, যার ফুটন্ত জলে নাকি পাঁচ মিনিটে চাল ফুটে ভাত হয়। 'একি কম কথা,' ভন মুলার ভারতীয় মন মানসিকতার আবেগে বলে—'একি ভগবানের কম লীলা!' আসলে শতকরা নিরানব্বুই জন লোকই যায় তীর্থ করতে—উৎস দেখে ঔৎসুক্য মেটাবে, হরেক রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিস্ময় প্রত্যক্ষ করবে, তেমন ধারণা প্রায় কারও নয়। সবাই চায় ধর্ম করতে—পাপমনস্ক দুর্বলচেতা মানুষের ধারণা, শুধু তীর্থ দর্শন করলেই সব পাপ মোচন হয়। ধর্ম হয়। ঝর্ণার ফুটন্ত জল স্পর্শ করলেও তীর্থের ফল মেলে!

লোভ এবং দুর্বলতা পাশ কাটিয়ে যমুনোত্রী যাওয়া আমাকে বাতিল করতে হল—আমি ভাবলাম, নদীর উৎস দেখে ধর্ম যদি করতেই হয়, তবে আর দুটো কেন—একটি দেখলেই কাজ হবে। এবং এজন্য মনে মনে আমি গঙ্গোত্রী বেছে নিলাম—যেতে যদি হয়ই গঙ্গোত্রীতেই যাব। এতে যমুনোত্রীর মাহাত্ম্য আমি খাটো চোখে দেখলাম কিনা সে কথা মনেই হল না।

ছেলেবেলায় দেশের বাড়ির অদূরে আমি 'যমুনা' নদী প্রথম দেখেছিলাম। সিরাজগঞ্জ ঘাটের কাছে। ফাল্গুনের সেই যমুনায় ছিল নীল-নীল স্বচ্ছ জল। গভীর গহন। নৌকোয় বসে ধলেশ্বরী থেকে বৃক্ষতীর-সমাচ্ছন্ন জল-উদার যমুনা দেখে আমি বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। দুঃখের সঙ্গে পরে আবিষ্কার করেছিলাম, ঐ যমুনা শ্রীযমুনা

নয়, তার পুলিনে কখনও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয়নি। তবু ঐখানে নৌকায় বসে আমি প্রথম শুনেছিলাম একটি মর্মস্পর্শী গান—নীল যমুনায় ভরা বেদনায় মিলন বাঁশরি বলো কে বাজালে! আশ্চর্য, তন্ময় মুহূর্তে আমি যেন সেই পরম বংশীবাদককে আবছা মতো দেখতেই পেয়েছিলাম! বালক বয়সের সে-যমুনা কবে হারিয়ে ফেলেছি!

গঙ্গার কথা আলাদা—ঘরের কাছে গঙ্গার নিত্যদর্শন ঘটেছে। ফাল্গুনের টলটলে গঙ্গায় ফ্রিজ-শীতল জলে ডুবিয়ে স্নান করেছি; বর্ষায় তার জলপ্লাবন দেখে শিউরে উঠেছি। তবু তো গঙ্গার অনেক মহিমাই রয়েছে। এভারেস্ট বিজয়ী এডমণ্ড হিলারি গঙ্গাসাগরে প্রথমে ব্রাহ্মণ দিয়ে গঙ্গামায়ের পুজো দিয়েছিলেন; তাঁর কলে-চলা হালকা নৌকোয় ধানদূর্বা সিন্দুর-ফোঁটা দিয়ে বামুন ঠাকুর আশীর্বাদও করেছিলেন। তারপর সেই নৌকোয় চড়ে এডমণ্ড হিলারি গঙ্গার একেবারে উৎস পর্যন্ত দেখতে গিয়েছিলেন। যার সমস্ত বিবরণ রয়েছে তাঁর নিজের লেখা 'ফ্রম ওশ্যান টু স্কাই' গ্রন্থে। নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে স্যার এডমণ্ড হিলারির ঘরে বসে তবু আমি শুধিয়েছিলাম তাঁর গঙ্গাযাত্রার অনেক কথা। 'গঙ্গা আপনাকে অমন করে টেনেছিল কেন' আমার এই প্রশ্নের জবাবে স্যার এডমণ্ড একটি আশ্চর্য কথা বলেছিলেন—'একথা বুঝিয়ে বলা যায় না। একবার উৎস পর্যন্ত চলে যাও, তখন বুঝবে।'

যমুনোত্রীতে না গিয়ে আমার ভালই হল—হনুমান চটিতে এক সাধুর দেখা পেলাম। বিচিত্র রকমের সাধু। দ্বিতীয়ত হিমালয় কোলে একটি গ্রাম দেখার সুযোগ হল। সে-গাঁয়ের নাম বাড়িয়া।

সাধুর নাম রামেশ্বরানন্দ, বয়স সাঁইত্রিশ, দেহ গৌরবর্ণ। আর্য নাক, দীপ্তিমান চোখ, দাঁতের সুগঠন, দেহের দৈর্ঘ্য আর মাথার জটাল চুলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, মুসিবাচি কথাটির মানে রামেশ্বরানন্দর মধ্য দিয়ে মূর্তি গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান-পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসার পথে তাঁর মা বাবা কচুকাটা হয়েছিলেন,

ব্যস—শুধু এইটুকুই রামেশ্বরানন্দর জানা আছে; কোথায় কোন্ জেলায় কোন্ গাঁয়ে বা কোন্ শহরের লোক তাঁরা ছিলেন, তা আজও অজ্ঞাত। তবে তাদের ছমাসের শিশুপুত্র যে রাজস্থানের পুষ্করে এসে পৌঁচেছিল এবং পুষ্করের পথ থেকে শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে সাধু মহারাজ শান্তানন্দ যে মানুষ করেছিলেন, সে খবর এখন সবাই জানে। কেউ শুধু জানে না, কি করে কার সঙ্গে শিশুটি পুষ্করে এসেছিল।

শিশুটি এবার বড়সড় হয়ে উঠেছে। মুখ্য চেলার মর্যাদা দিয়ে দীক্ষান্তে শান্তানন্দজী তার নাম রেখেছেন রামেশ্বরানন্দ। শান্তানন্দই তাঁর গুরু মহারাজ। এন্তেকাল করবার আগে গুরু মহারাজজী নাকি রামেশ্বরানন্দর নামে ব্যাঙ্কের খাতায় ষাট লাখ টাকা রেখে যান। সে দশ বছর আগে ১৯৭৪ সালের কথা। এবং সেই টাকাই শেষ পর্যন্ত রামেশ্বরানন্দর কাল হয়ে দাঁড়ায়। গুরু মহারাজের আরও সাত শিষ্যও অনেক টাকা পান—প্রত্যেকে এক লাখ। সংসার-উদাসীন বিষয়-নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী গুরু মহারাজের হাতে এত টাকা কি করে এলো, কেনই বা সন্ন্যাসী শিষ্যদের তিনি পরমার্থের বদলে এত অর্থ দিয়ে গেলেন, তা আজ অনেকেরই প্রশ্ন। জটিল প্রশ্ন।

ব্যাঙ্কের অঙ্কস্ফীত আট সাধুর ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ বিপদ এলো বছর তিনেক আগে, রামেশ্বরানন্দর ম্যানেজার ব্রহ্মানন্দকে গুণ্ডাবদমাসরা খুন করলে। খোদ রামেশ্বরানন্দও নাকি খুন হয়ে যেতেন সময়মত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে না গেলে। এখন নাকি তাঁর প্রাণ নিতে মস্ত একটি খুনীদল গোকুলে বেড়ে উঠেছে—এবং এবার তারা তাঁর সব সম্পত্তি বেদখল দেবার মতলবে আছে। শুধু কি তাই? রামেশ্বরানন্দের বিরুদ্ধে তারা অনেকগুলি মামলা দায়ের করেছে—ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ (হত্যার চেষ্টা) ৩৮০ (পর সম্পত্তি লোপাট), ৪২০ (প্রতারণা), ৩০২ (হত্যা), ৪২৭ (ধোকাবাজি) ইত্যাদি ধারা মোতাবেক। তাঁর পক্ষে মামলা লড়ছেন তিন উকিল; একজন আজমীরে, দুজন জয়পুরে। রামেশ্বরানন্দ

নিজে কোথাও না বেরিয়ে হনুমান চটির অদূরে হনুমান গঙ্গার ধারে কুটির তুলে তিনবছর যাবত আত্মগোপন করে আছেন। ওখান থেকেও পি-ডবলু-ডি তাঁকে উৎখাত করার চেষ্টা করে নাকি হেরে গেছে।

এই হচ্ছে রামেশ্বরানন্দজীর অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস—মনে হয়, ভবিষ্যৎ তাঁর সম্পূর্ণ অন্ধকার। সাতবছর আগে রামেশ্বরানন্দ ছিলেন একেবারে যমুনোত্রীতে—মারণ, উচাটন, ধ্যান, যোগ, প্রাণায়াম, সমাধি ইত্যাদির চর্চা তখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল—স্বয়ং গুরু মহারাজ আগেই তাঁকে এসব নাকি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

খুন-খারাপি এবং ঘুষ দেশে যে অনেকের অনেক অপকার ঘটিয়ে তুলছে রামেশ্বরানন্দ নাকি সে বিষয়ে বিশেষ ওয়াকিবহাল—রাজস্থানের মামলায় বিপক্ষদল পুলিশকে পয়সা খাইয়ে যে কেবলই কেস খারাপ করছে এবং একদিন যে তার প্রতিশোধ তিনি নেবেন সে কথা বিশেষ দর্প করেই বললেন।

'কেস হারলে যোগবলে আমি সব শেষ করে দেবো', যোগী মহারাজ রামেশ্বরানন্দ আস্ফালন করতে লাগলেন—'বৃষ্টি বন্ধ করে দেবো, তুফান চালিয়ে দেবো, সব রকম বেমারি ছড়িয়ে দেবো—যারা বদমাসদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবো আমি কে!'

কি বলব আমি ভেবে পেলাম না—আমার মতো অযোগী, অভোগী যাযাবরকে এসব কথা বলার অর্থও বোঝা গেল না। 'জানলে', চকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে রামেশ্বরানন্দ বললেন—'যোগবলে আমি ইন্দিরা গান্ধীকে পর্যন্ত এখানে আনতে পারি!'

'কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বিফল হয়েই তো তিনদিন আগে আপনি দিল্লী থেকে ফিরে এসেছেন', আমি প্রতিবাদ করে বললাম—'তখন কেন যোগবল প্রয়োগ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলেন না?'

'যোগবল প্রয়োগের সময় এখনও আসেনি।' সাধুজী চট করে জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু এর পর যা শুনলাম, তা বিশেষ চমকপ্রদ। 'কিছুদিন আগে বদরীতে আমি একটি মন্দির তৈরী করেছি কোটি টাকা খরচ করে। দানের টাকা।' রামেশ্বরানন্দ বললেন—'এবং ওখানেই অত্যাশ্চার্য একটি ঘটনা ঘটে।'

হনুমান চটির ওধারে তখন পাহাড়ের ছায়া পড়েছে—কুলী, খচ্চর, ঘোড়ারা সারে সারে দাঁড়িয়ে আছে। বারো কিলোমিটার চড়াই ভেঙে যমুনোত্রীতে যাবার জোর না থাকে ঘোড়ার পিঠে, খচ্চরের পিঠে, নয়তো কুলীর পিঠে উঠে চলে যান। কিন্তু আজ আর যমুনোত্রী যাবার সময় নেই। ঘোড়া খচ্চর কুলীরা তাই দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে সাধুবাবা আর আমাকে ঘিরে কিছু লোক জমেছে—তাদের সামনে আমরা কথা বলছি ইংরেজীতে, যা কেউই বুঝতে পারছে না। দুটি ভিন প্রদেশের লোক এক হলে যে আজও কথা কয় ইংরেজীতে, তা ভারতভ্রমণরত বিদেশী লোক খুব ভাল করে লক্ষ্য করে, আর ভাবে—এ কেমন দেশ রে বাবা!

কথাপ্রসঙ্গে রামেশ্বরানন্দ আজ তাঁর জীবনের একটি গূঢ় কথা আচমকা বলে ফেললেন; তাঁর স্বল্প বিবাহের কথা। তখন তাঁর সামনে মস্ত একটি চ্যালেঞ্জ এসে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে পড়েছে, অন্তত তাই তাঁর তখন মনে হল—বদরীতে বসে এক যৌবনমত্তা জার্মান নারী ঘোষণা করে বসলেন, যে তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে তাকেই তিনি বিয়ে করবেন; দ্বিতীয় শর্তমত তাকে অবশ্য ভারতবাসী হতে হবে। একজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী কেন যে বিচলিত হবে, কেন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে তা আমরা ভেবে পাই না। রামেশ্বরানন্দ নিজেও তখন তা ভাবতে পারেননি। কিন্তু সদর্পে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সাধুজী কোন সুবিধা করতে পারলেন না, মদালসা নারীর ঘর থেকে মুখচুন করে ফিরে এলেন। জেদ গেল বেড়ে; সাধুজী হিমালয়ে ঘুরে ফিরে কিছু বিচিত্র উদ্ভিদ শেকড় সংগ্রহ করে আনলেন। সেই শেকড় নির্যাসিত মহাশক্তি সুধা কিঞ্চিৎ যোগবল মিশ্রণে সেবন করে দশ অশ্বশক্তির দাপটে এবার তিনি জার্মান নারীকে নাজেহাল করে

ছাড়লেন। পূর্বশর্ত অনুসারে তাদের বিয়েও হল; কিন্তু হ্যামবুর্গে নিয়ে ঘরজামাই থাকার জন্য নববধূর প্রস্তবে সাধুজীর পছন্দ হল না। বধূসজ্জা খুলে নারী তখন একাকিনী বদরী ত্যাগ করলেন; বোধহয় নতুন নাগরের সন্ধানে।

রামেশ্বরানন্দর সব কথা অবিশ্বাস করার কারণ দেখি না। 'আমার সব চাইতে বড় শত্রু কে জানেন', সাধুজী বললেন—' আমার সত্যভাষণ।' তাহোক, কেনই বা তিনি অপকর্মে লিপ্ত হন, কেনই বা তা নিয়ে সত্যভাষণের ডম্পাই করেন, সাঁইত্রিশ বছরের ছিপছিপে তাজা জোয়ান কেন সাধুর ভেক নিয়ে ঘুরে বেড়ান, গেরুয়া বসনের অবমাননা করেন, তার জবাবদিহির গরজ তাঁর একেবারেই নেই। ভারতীয় দণ্ডবিধিমতে হত্যা, প্রতারণা, ঠকবাজি ইত্যাদি হরেক রকম অভিযোগ তাঁর মাথার উপর ঝুলছে এবং দিব্যি তা তিনি আমাকে খুলে বললেন! সাধুজী আসলে আশ্চর্য এক হিমালয়ী বৈচিত্র্য, যার ধার আছে, ভার আছে, একটি হালকা গভীরতাও আছে! জার্মান মেয়ে দিয়ে বউনি করার পর কিছু ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান মহিলাকেও নাকি তিনি করুণা করেছেন। এবং বদরীতেই। তবু নাকি তিনি সাধু। এবং ব্রহ্মচারী। এবং যোগবলে বলীয়ান! তাই তো আমাকে বললেন!

হনুমান চটির দেড় কিলোমিটার দূরে যাটটি পরিবারে চারশ লোক নিয়ে বাড়িয়া। ছোট্ট গ্রাম। সেখানে পাকা সড়ক নেই, বড় ইস্কুল নেই, বেশ খানিক একটানা সমতল ভূমি নেই। ভারি লেখাপড়াজানা বড় চাকুরে কিংবা কবি-বাগ্মী-লেখক কেউই সেখানে জন্মাননি। বলতে গেলে গাঁয়ের প্রায় সবাই চাষী লোক। ক্ষেতি করে। পাহাড়ী জমি আবাদ করে গম, মিঠা আলু, রাজমা, চোওলাই ফলায়। রাজমার ঝোল যায়, চোওলাই সেদ্ধ করে ডাল করে। চোওলাই বা চৌলি দিয়ে একটি জনপ্রিয় মিঠাই হয়, নাম তার রামদানা। দিল্লীকা লাড্ডুর মতো।

বাড়িয়া গাঁয়ের লোক বছরে যে পরিমাণ শস্য ফলায় তাতে চারশ লোকের তিন মাসের বেশি চলে না। 'নিচে সে দানা পড়তা হ্যায়', জয় সিং বললেন— 'লেকিন, কোই ভুখা নেই মরতা হ্যায়।' দয়ারাম খানোয়া সঙ্গে সঙ্গে বলেন—' 'ভুখে কেইসে মরেগা সাব,—যমুনাজীকা পানি পী লেগা, থোরা হরিপাত্তি খা লেগা, ব্যস।'

'হরিপাত্তি?' যুবক বুদ্ধি সিং পাণ্ডোয়ার বলে—'ওতো পাহাড়ী গাছগাছরার পাতা, বাবুজী। সেদ্ধ করে খেয়েও তুচারদিন জীবন বাঁচানো যায়।'

বাড়িয়া উত্তরকাশী জেলায়—উত্তরপ্রদেশের লোক বলে সবার ভাষাই হিন্দী। অযোধ্যা মথুরা কানপুরের মতো লেখার ভাষা এক হলেও এই হিমালয়ী অঞ্চলে কথ্য হিন্দীর উচ্চারণে অকথ্য রকমের টান আছে, কথ্য বাংলায় চাঁটগাঁ-নোয়াখালি কিংবা নদে-মুর্শিদাবাদী ঢঙের মতো—নদীয়ার লোকের পক্ষে বরিশালী-টানে বাংলা, এলাহাবাদীদের পক্ষে হিমালয়ী-টানের হিন্দী প্রায় একই বস্তু। বাড়িয়ার সব লোকের পদবীই সিং। এবং কেউই তারা শিখ নয়। রাজপুত। বিশ পঁচিশ ঘর ব্রাহ্মণ আছেন। প্রায় সবাই পুরুত ঠাকুর। 'রাজপুত, মজবুদ'—তেজী যুবা বুদ্ধি সিং পাণ্ডোয়ার আগে ভাগেই জানিয়ে রাখে।

'আমরা শুধু রাজপুত নই' জয় সিং জোর দিয়ে বলেন—'আমরা পাণ্ডোয়ার। বড় জাত।' গড়গড়া মুখে কাছে বসে এক বর্ষীয়ান গ্রামবাসী জানান—'আমার নাম শুধু শ্যাম সিং নয় বাঙ্গালি বাবু, শ্যাম সিং পাণ্ডোয়ার। ভুলো মাৎ।' আমি ভুললে কিছু আসে যায় না; কোন বঙ্গসন্তানের পক্ষে হিমালয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনা যখন খুবই কম, বড় জাত, বড় ঘরের কথা মনে রাখার দরকার তখন কোথায়! তবু সিং-রা যে পাণ্ডোয়ার এবং বড় জাত, সে কথা আমি মনে রেখেছি। এখনও আমার মনে আছে!

এই অঞ্চলে মোট বারোটি গ্রাম আছে, নামগুলি কিছু নতুন রকমের—বাড়িয়া, রাণা, দাঙ্গার গাঁও; পিণ্ট্‌কি, মদেশ, নিশনি;

বানোশ, দুরবিল, কুঠার ; বিরু, সীমন্ত, খরশালি। বারো গাঁয়ে সব মিলে মোটে তিনহাজার লোকের বাস অর্থাৎ প্রতি গ্রামে লোকসংখ্যা গড়ে আড়াইশ জন। প্রায় সবাই রাজপুত ; কিছু মারাঠা রক্তধারী লোকও আছে। রাজপুতরা হরিয়ানা, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বহুযুগ আগে এসে বসবাস শুরু করেছিল। কিন্তু কবে এবং কেন তাদের আগমন সে ইতিহাস জয় সিং, শ্যাম সিং, বুদ্ধি সিং-রা কেউই জানে না।

শুধু সিং-সিং আর সিং পদবী শুনে ওদের আমি একটা মজাক-মস্বরীর গল্প বললাম, পাঞ্জাবী সিং আর বাঙ্গালি বাবুর ট্রেন-কামরায় কথোপকথনের একটি অংশ। বাঙ্গালি বাবু সর্দারজীকে পুছ করলেন—মশায়ের নাম ?

'একশ শের সিং চীমা,' 'মোছে তা দিয়ে সর্দারজী বললেন—'লেকিন আপকা নাম ?'

'আমার নাম ?' বাঙ্গালি বাবু বললেন— 'আমার নাম দুইশ শের তিনশ ভালু চারশ সিং দেবশর্মা ! সর্দারজীর চোখ ছানাবড়া—এ যেন শঠতার উপর শঠতার গল্প ! গল্প শুনে সবাই খুব হাসলেন।

জয় সিং-এর ঘরবাড়ির দিকে এবার একটু চোখ ফেরানো যাক। একজন মালদার লোকের অবস্থা কেমন তা না জানলে কি আর চলে ! এদিকে জমির মাপ বিঘে কাঠায় নয় ; নালীতে। পাঁচ নালী নাকি এক বিঘার মতোন। নালী-প্রতি গমের ফলন গড়ে কুড়ি কেজি মাত্র। সম্বৎসরে জয় সিং-এর পাঁচ কুইণ্টাল গম, পঁচিশ কুইণ্টাল মিঠা আলু, ছ কুইণ্টাল চৌলি ফলে। আলু বেচে কিছু নগদ পয়সা হয়, কখন-সখন গমের বদলে ওরা আলুই খায়। 'আলুকা রোটি, আলুকা সবজী'—হালকা হেসে রাধিকা দেবী বলেন। ইনি জয় সিং-এর ঘরণী। বড়ী বহু। 'শুধু রাধিকা নয়', জয় সিং জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন—'শ্রীমতী রাধিকা দেবী।'

এক মেয়ের পর ছেলে হবার কোন লক্ষণ না দেখে রাধিকাদেবী নিজের ছোট বোন সুন্দরার সঙ্গে আপন সোয়ামীর বিয়ে দেন।

দুদিন আগে হরিদ্বার ঋষিকেশে কি গরমই ছিল। ছ'হাজার ফুট উঁচু হনুমান চটিতে দিনের সূর্যতাপে দাহিকা নেই—রাতে বঙ্গভূমির পৌষমাস।

শ্রীমতী রাধিকা দেবী চা বানিয়ে এনেছেন। কাছেই বড্ড বেশি মাছি ভন ভন করছে। 'আমাদের একতলার বাসিন্দারা তেমন পরিচ্ছন্ন জীব নয়', রাধিকা দেবী হেসে বললেন— নিচের চার কামরায় কে থাকে জানেন? একটা গাই, দুটো বয়েল (বলদ), দুটো ভইস, দুটো খচ্চর এবং পঞ্চাশটি ভেড়।' ভেড় কি? আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন শ্যাম সিং— 'আরে ইয়ার, তাও জান না—যা মোটা মোটা পশম দেয়, ম্যা-এ-এ করে ডাকে।' অর্থাৎ সোজা কথায় ভেড়াকে ওরা ভের বলে। আমাদের মুখ দিয়ে ভেড়া বলতে শুনলে ওরা হয়তো অবাক হয়ে বলবে—আরে কি আশ্চর্য, বাঙ্গালিরা ভেড়কে কিনা ভেড়া বলে!

পঞ্চাশটি ভেড়া বছরে যে পরিমাণ পশম দেয় তা জয় সিং-এর বৃহৎ পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। কোন মাংসই এরা খায় না, মাছও না অর্থাৎ কট্টর নিরামিষ ভোজী। কিন্তু মাংসের দামে ভেড়াগুলো বেচে দিব্যি পয়সা কামায়—ভেড়া পিছু সাতশ টাকা। ভেড়া সঙ্গে খায় মরুক গে—যে কাটে পাপ তো তার; জয় সিং-রা বোধহয় তাই ভাবে। কিন্তু মশয়, খাইয়ে বেশি পয়সার লোভে ওদের নাদুস নুদুস কে করে, কে দেয় ওদের মুণ্ডু হাঁড়িকাঠে এগিয়ে!

ঈশ্বরেচ্ছায় জয় সিং-এর আয় রোজগার বেশ ভালই হয়। হনুমান চটি থেকে বিভিন্ন খাতে বছরে কম করে আসে সত্তর হাজার টাকা, অথচ মূলধন বলতে এখন বিশেষ কিছুই খাটাতে হয় না—আনন্দভবন তৈরী করতে একবারই যা খরচা হয়েছিল, মোট হাজার পঞ্চাশেক টাকা। যমুনাজীর কৃপায় জয় সিং এখন ধনীলোক, বাড়িয়া গাঁয়ের এক নম্বর পুরুষ বলে মার্কামারা—যদিও তার চাইতে বয়সে প্রবীণ লোক আরও আছেন। টাকার জোর নেই বলে তাদের সামাজিক জোর কম।

মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া বইছিল। মধ্যদিনের রোদ গায়ে মেখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে ভালই লাগছিল। আমাকে তারিফ করতে দেখে রাধিকাজী মুখ খুললেন। 'বড় গলায় বলার মতো আমাদের আর কিই বা আছে বাবুজী', শ্রীমতী রাধিকা বললেন—'এখানে ভাল সব্জী মেলে না, চাল নেই, ডাল নেই—হাওয়াটাই যা আছে ; গরমের দিনে শরীর জুড়িয়ে দেয়।'

এখানে দেখছি মেয়েরা কেউ শাড়ি পরে না, পাঁচ গজী ছিট কাপড় লুঙ্গির মতো পরে, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায় যাকে বলে সারঙ্গ ; হিমালয়ে বলে ধোতি। কোমরে আবার ছ'গজের পাগড়া, মনোরম কায়দায় আঁট করে পেছানো থাকে, যা ধোতিকে যথাস্থানে ধরে রাখতে বেল্টের মতে কাজ করে।

আরেক পাড়ার দুটি মেয়ে আজকের আসরে হাজির ছিল—উনিশ বছরের বিজলী, ষোল বছরের জয়শীলা। জয়শীলা রাণা গাঁয়ে হাই ইস্কুলে পড়ে। কারও এখনও বিয়ে হয়নি। বিজলীদের পরণেও ছিল ছয়গজী বেল্ট-আঁটা পাঁচ-গজী ধোতি। মিনি বা ম্যাক্সি হিমালয়ে এখনও চোখে পড়ছে না।

বারো হাত কাপড়ের জবরজং বেল্ট না পরলেই কি নয় ? আমার প্রশ্নে মেয়েরা নিঃশব্দে হেসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, একটু নড়ে চড়ে বসল—যেন এর কোন মেয়েলী মানে আছে, যা নিয়ে আমার মাথা ঘামানো ঠিক শোভা পায় না।—কিংবা ওদের হাবভাব, হাসি সবই আমার অজ্ঞতাজনিত প্রতিক্রিয়া।

আমার প্রশ্নের জবাব শেষপর্যন্ত দিলেন রাধিকা দেবী এবং অবিলম্বে [illegible] কিছু অভিনব আলোচনায় মোড় নিল। সেকথাও আমাদের বলতে হবে বৈকি।

'তুমি কি জান না বাবুজী' শ্রীমতী রাধিকা বললেন—'আমাদের রীতিমতো খেটে খেতে হয়—'

'কার না খেটে খেতে হয় রাধিকাজী', আমি বাধা দেই—

'পৃথিবীতে কাজ করে খেতে হয় সবাইকেই—বাড়ি পাহারা না দিলে কুকুরকেই কি আর কেউ খেতে দেয় ?'

'কিন্তু আমাদের হাড়ভাঙা খাটুনির বহর কি তোমার জানা আছে বাবুজী', মৃদু হেসে শ্রীমতী রাধিকা বললেন—'আমাদের যে ক্ষেতে খামারেও কাজ করতে হয়। ব্যাটাছেলে জমিতে গিয়ে শুধু হাল দিয়েই খালাস।—এবার তোমরা মেয়েরা মর—বোনো, কাটো, মাড়াই-ঝাড়াই করে কাঁধে গম-আলু-মৌলির বোঝা নিয়ে চড়াই-উৎরাই ভেঙে বাড়ি ফেরো।'

আমি নড়েচড়ে বসি। পাহাড়ী মেয়েদের করণীয় এইসব কাজের কথা আমার মনেই হয়নি। ক্ষেত-খামার-সংগৃহীত শস্যের গুরুভারে স্তোকনম্রা হয়ে পাহাড় ভেঙে ফিরতে কোমরের ধোতি যে স্থানচ্যুত হতে পারে এবং সেই কারণে বারো হাত কাপড়ের বেড় পরা যে দরকার, এবার সেই কথা খোলসা করে বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীমতী রাধিকা মন্তব্য করলেন—'জমিজিরেতে কাজ করে আমাদের জান্ একেবারে কয়লা হয়ে যায় বাবুসাহেব।'

রাধিকার আপন হাতে সাজানো গড়গড়া গুড়ুক গুড়ুক করে টানতে টানতে শ্যাম সিং চোখ ছোট করে রাধিকাকে দেখতে থাকেন, যেন তার প্রগলভতা সীমা ছাড়ায় কিনা তা লক্ষ্য রাখা দরকার।

'এই যে বাড়িতে এতগুলো গরু ভেড়া দেখতে পাচ্ছ,' ঘরের বৌদের খেটে খাওয়ার আরও কিছু নমুনা পেশ করতেই বোধ হয় মহিলা এবার বলেন—'বরফ পরা শীতকালের মাঠে ওদের তো আর ঘাস বিচুলি মেলে না। সেই দুর্দিনের জন্য ঘরে ওদের খাবার কে যুগিয়ে রাখে জান ? মেয়েরা।—পাহাড়ে বসে ঘাস কাটো, বড়ালি পাকিয়ে বোঝা বাঁধো, তারপর ঘাড়ে বয়ে ঘরে এনে গুদামজাত করো। সব দায়, সব দায়িত্ব আমাদের। এই গ্যাখো', দুই হাতের পুরুষ্টু করপুট প্রসারিত করে রাধিকাজী বললেন—'ক্ষেতে কাজ করে করে হাতে কড়া পড়ে গেছে!'

আমার হঠাৎ দেশ-গাঁয়ের একটি বাঙ্গাল কথা মনে পড়ল।

বাবুরালি শেকের বৌ আমিনা খাতুন মুনিষকে বলতেন—বড়ালি পাকাইচস্ নি ? মুনিষ বলত—ক্যান্ ? আমিনা বলতেন—খ্যারের (খর/বিচুলি) বোজা (বোঝা) বাইনতে অইবো না ? হিমালয়ে বসে সেই ধলেশ্বরীর পারের বড়ালি কথাটা শুনতে কি ভালই লাগল !

কিন্তু সে যাক। শ্রীমতী রাধিকার হাত দেখে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। জায়ারূপে যারা আমাদের পেটে ধরেন, জননী-রূপে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে মানুষ করেন, সেই কমজোরী নারীরা কি করে যে এত সব কঠিন কাজ করতে পারেন আমি ভেবে পাচ্ছি না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে কবি নজরুল তা ঘর ছেড়ে মেসোপোটে-মিয়ার পথে এগিয়েছিলেন। হিমালয় তাঁকে টেনেছিল তেমন কথা কেউ বলে না। তবু হিমালয়বাসিনী রাধিকাদের মনের কথাই তিনি লিখেছিলেন—

অদ্ভুৎরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ—
বুকে করে তারে চুমিল যে তারে করিল সে অবরোধ !

শ্যাম সিং-এর কাছেই জয় সিং বসে আছেন। জয় সিং যেন বিরোধী দলের নেতা—আপন পত্নীর মুখে মারাত্মক সব অভিযোগ বসে বসে শুনে মজা পাচ্ছিলেন, কিংবা মরমে মরে যাচ্ছিলেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শ্যাম সিং-এর মুখ থেকে গড়গড়ার নল নিয়ে নিজের মুখে দিয়ে টানতে আগেই ভুলে গিয়েছিলেন। আমি কিছু বোকামির পরিচয় দিলাম, রাধিকাজীকে শুধালাম—'ক্ষেতে কাজ করার দিনে রান্নার কাজও কি তোমাদের করতে হয় ?'

'কেন, তোমার বৌকি ঘরে রান্না করে না', খ্যাক করে উঠে শ্রীমতী রাধিকা আমাকে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করেন—'নাকি ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়ায়, আর তুমি—'

'আমি ?' হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার মতো করে বলি—'আমি ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ পাই। ভূতে আমার খাওয়া যোগায়।'

সবাইকে না বুঝে হি হি করে হাসতে দেখে আমার হোটেলে

খাওয়ার রহস্য ব্যাখ্যা করে বলতে হয়। কিন্তু সে সব কথা থাক। রাধিকাদের কথায় তাল কেটে গেলে তো চলবে না।

এবার আমি কিছু বক্রোক্তি করে বলি—'দেখতে পাচ্ছি, তোমরাই ক্ষেতে কাজ কর, ঘাস কাটো, ভাত রাঁধো—তা হলে ওরা কি করে, তোমাদের মরদগুলো?'

'কি আর করবে, 'শ্রী রাধিকা তাচ্ছিল্য করে বলেন—'খাতা, পীতা, আউর ঘুমতা হ্যায়!'—

'ব্যস, আর কিছু নয়!' বিস্ময়ের সঙ্গে আমি ফের বলি। মনে হল যেন রাধিকাজী আমার কথাটিকে একটু বিবেচনা করে দেখলেন, দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললেন—'আউর কিয়া?'

'আউর কিয়া! পুরুষ মানুষ, আর কিছু—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই রীতিমতো দুষ্ট হাসি হেসে বৃষভানুনন্দিনীর নামধারিণী হিমালয়ী মহিলা বলেন—'আউর বগল মে শোতা হ্যায়!'

রীতিমতো হাস্যরোল পড়ে গেছে। জয় সিং-এর নিঃসন্তানা বর্ষিয়সী বোন দ্রৌপদী কোঁকলা দাঁতে হেসে অস্থির—হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে গেছে। তার আপন ভ্রাতৃবধূটি যে এমন লঘুবাক্যবিনোদিনী, এমন লক্ষ্যভেদী সুরসিকা তার নিখুঁত প্রমাণ যে আজই পাওয়া গেছে—তবে কিনা এক সমতলবাসী মেহমানের সামনে। জয় সিং শ্যাম সিং বুদ্ধি সিং-রা যেন বিলকুল বোকা বনে গেছে। এর যে একটা কিছু বিহিত করা দরকার, একটা জবাবের মতো জবাব দেওয়া দরকার, তা যেন কারও মাথায় আসছেই না।

জয় সিং-এর অবস্থা প্রায় কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের মতো, একটা দুর্জয় মোহগ্রস্ততা তাকে যেন পেয়ে বসেছে; আপন প্রিয়ার 'বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধ ঘোষণা করার কথা তার মাথায় খেলছেই না—'দেখি হালায় শেষ তক কি করে' তার যেন এমনি একটি ভাব।

জয় সিং-পত্নী বৃন্দাবনের যমুনাতীরবনচারিণী রাধিকা নয়,

যদিও বাড়িয়া গ্রামের অবস্থান প্রায় উৎসমুখে যমুনার ধারে। সবাই এখানে কথায় কথায় বলে—যমুনাজীর কৃপা হলে—অর্থাৎ যমুনাকৃপায় আমার অমুক হবে, তমুক হবে ইত্যাদি। স্বয়ং জয় সিং-পত্নী রাধিকাদেবীর মুখেও প্রায়ই শোনা যায়—যমুনাজীর কৃপা হলে—। সেই রাধিকার কথাবার্তা আজ কেন মাত্রাছাড়া হালকা হয়ে গেছে, তা ভেবে জয় সিং-এর খুব ভাল লাগছে না। শ্যামজীর মনের অবস্থাও এখন খুব খারাপ—অবিলম্বে রাধিকাকে থামিয়ে দেবার, তার কথার জুতসই জবাব দেবার খুবই তার তাগিদ বোধ হচ্ছে।

'ওকে পুছ্ছ করুন তো' সাহস সঞ্চয় করে শ্যামজী কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে অগত্যা আমাকেই বলেন—। 'শ্রীমতী রাধিকাকে পুছ্ছ করুন তো বাঙ্গালি বাবু। ওদের যারা বিয়ে করে আনে তারা পুরুষ বটে তো—বিয়ে করে ঘরে এনে কোল ভরে ছেলে দেয়, হাত ভরে কাগজ ভরে দেয়—'

শ্যামজী মুখ খুলতেই আমি চমকে উঠেছিলাম। এবার যে উভরপক্ষে বাদ-প্রতিবাদ চলবে, জয় সিং-এর মাদুর-পাতা মেঝেটা ডিবেটিং ক্লাবের রূপ নেবে। এবং শেষ পর্যন্ত আমাকেই মধ্যস্থ মানা হবে, তা আমার ভাল লাগছিল না। সভাপতিত্ব করার যোগ্যতা যে আমার নেই, তা আমার চাইতে ভাল জানে আমার পরিচিত সব লোক। কিন্তু শ্যামজীর কথায় হঠাৎ আমার কর্ণযোগ বিশেষ আকৃষ্ট হল, চট করে বললাম—'বিয়ে করে এসে বৌকে হাত ভরে কাগজ দেয়, অস্যার্থ?'

'তাও জানেন না বাঙ্গালি বাবু,' কথায় শ্লেষ না ফুটিয়ে বরং জ্ঞান দেবার সুযোগ নিয়ে শ্যাম সিং সোচ্চার হলেন—'নোট, কাগজের নোট গো মশাই—শত শত টাকার নোটের তাড়া।'

আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটেছে ভেবে শ্যাম সিং আরও বাড়তি কিছু বলার দরকার বোধ করেন—' বুঝুন একবার, ছেলে দেয়, গয়না দেয়, ক্যাশ বাক্সের চাবি ছেড়ে দেয়—একি কম কথা।' অথচ এসব ওদের মনে থাকে না। আশ্চর্য!'

আমি চুপ করে যাই। হিমালয়বালাদের মতো আমাদের জেনানারা জননী হয় ঠিকই, তারা আঁচলের শক্ত গিঁটে চাবিও বাঁধে ; কিন্তু ক্ষেত-খামারে গিয়ে তাদের শস্য বোনাকাটা করতে হয় না, পাহাড়ে উঠে ঘাস কাটতে হয় না, ঘাস-বিচুলির আঁটি, শস্যের ভার ঘাড় নুইয়ে বয়ে আনতে হয় না। ছেলেবেলার গ্রাম-সঙ্গী নিতাইয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল। তার বয়স তখন বছর দশেক। ধ্যানধারণা কিছু পাগলাটে। কথাবার্তা রগচটা। বাড়িতে ওর জামাইবাবু এসেছেন। সামনের সড়ক দিয়ে ওপাড়ার লোক মাটির ভাঁড়ে দুধ নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। বেচতে। নিত্যানন্দ হঠাৎ ক্ষেপে গেল, দুধের হাঁড়ি-মাথায় লোকদের শ্যালক সম্বোধন করে বলল—'জানিস না আমাদের বাড়িতে জামাই এসেছে ? বাজারে না গিয়ে এইখানে দুধ দিয়ে যেতে পারিস না ? আমরা পয়সা দেই না নাকি ?'

তারপরই বোধ হয় নিতাইয়ের মনে হয়ে থাকবে, দুধ চাওয়াটা সামান্য ব্যাপার। আপন দাবির বহর বাড়িয়ে নিতাই আবার তাই বলে—'কাল থেকে শ্যালকরা দুধ ক্ষীর করে নিয়ে আসবি !'

কেন নয় ? নিতাইরা পয়সা দেয় বটে তো !

আমি সত্যি অবাক হয়েছিলাম। নিতাইদের বাড়িতে জামাই এলে যে শুধু দুধ নয়, দুধওয়ালাদের ক্ষীর করে এনে দেওয়া উচিত এবং এই কথাটি কেন যে তাদের মনে আসেনি তাই ভেবে তখন আমার ভারি আশ্চর্য ঠেকেছিল। নিতাইয়ের যুক্তি যে অকাট্য, দাবি সঙ্গত, দুধওয়ালাদের স্মরণ করিয়ে-দেওয়া উপস্থিত বুদ্ধি যে বিস্ময়কর, তা বুঝে নিতাইকে আমি তখন প্রায় ভক্তের চোখে দেখেছিলাম। ক্ষেতে-খামারে খাটুনি, বাড়িতে হাঁড়িঠেলার বিনিময়ে ঘর-সংসার এবং টাকা পয়সা পেয়েও রাধিকারা কেন যে তার মর্ম বোঝে না, আজ নিতাই উপস্থিত থাকলে ঠিক তার সদুত্তর দিয়ে দিত।

জয় সিং তখনও জরদ্গবের মতো বসে আছেন, শ্যাম সিং-এর

মুখে কথা নেই। আবহাওয়াটা কিছু যেন থমথমে। হঠাৎ কানে এলো শ্রীমতী রাধিকাদেবীর কথা—চা পিয়োগে বাবুজী!

হাতে পক্ষাঘাতপঙ্গু সুন্দরাকে আমি একবারই হাসতে দেখেছিলাম। তারপর থেকে সুন্দরা কেমন নিস্তেজ নিষ্প্রভ মনোদুঃখী হয়ে বসে আছে; প্রাণপ্রচুরা রসময়ী রাধিকাদেবীর বকবকানি তার কেমন লাগছে কে জানে। সুন্দরার রোগটি নাকি নেহাতই আকস্মিক। অথচ এই হিমালয়ী অঞ্চলে তেমন কোন রোগ নেই, কলেরা-বসন্ত-আন্ত্রিক ব্যামো কিছুই নেই; সর্দিজ্বরের উপরে নাকি বড় কেউ যায় না। শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেমন প্রাইমারি ইস্কুল, হাই ইস্কুল আছে, এখানে তেমনি জন্মনিরোধের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ডাক্তার নেই। রোগ থাকলে তো ডাক্তার!

সুন্দরার মেয়েটি বেশ দীপ্তিময়ী, গায়ের রং লাল-লাল। নাক চোখেরও সুন্দর গঠন। 'বেশ স্মার্ট দেখতে', আমি বললাম—'একদিন হয়তো ইন্দিরা গান্ধীর মতো হবে—হয়তো ভারতের প্রধান মন্ত্রীই হবে।'

'প্রধান মন্ত্রী হয়ে কাজ নেই', সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন স্বয়ং রাধিকা দেবী— 'বরং বাছা আমার ক্ষেতখামারে কাজ করবে, বাচ্চা দেবে, রান্না করে মরদকে খাওয়াবে!'

তাহলে এই রাধিকাদেবী এতক্ষণ যেসব কথা বলেছিলেন, অভিযোগ উঠিয়েছিলেন, তার কি কোনই অর্থ নেই, কোন মূল্য নেই? আমি যে এরই মধ্যে আমেরিকার উইমেন্‌স্‌ লিবের দুর্ধর্ষ নেত্রী ডোরিস ডোরবেকারের সঙ্গে শ্রীমতী রাধিকার কিছু কিছু মিল খুঁজে পেয়েছিলাম। তাহলে ভারতের নারী কি মনেপ্রাণে শুধুই নারী; গায়ে পাহাড় ঠেলে, হেঁসেলে হাত পুড়িয়ে, পেটে ছেলে ধরে ভাবে, জীবনে এর চাইতে মহতো-মহীয়ান আর কিছু নেই!

'আউর থোরা চায়ে পী লিজিয়ে বাবুজী'—হঠাৎ শ্রীমতী রাধিকা দেবীর কথা কানে আসতেই পৃথিবীর সমতলে নেমে এলাম। পাশের বাড়ি থেকে তখন একটি নতুন মেয়ের আবির্ভাব ঘটেছে। রাধিকা

সঙ্গে সঙ্গে তার সাদর অভ্যর্থনা করলেন, তার থুতনিতে আপন হাত লাগিয়ে চুমু খাওয়ার মতো করে নিজের মুখ ছোঁয়ালেন। অন্য সব মহিলা রাধিকাজীকে অনুসরণ করল। এ যে আমাদের বঙ্গভূমির মতোই ব্যাপার-স্যাপার।

মেয়েটিকে বললাম—তোমার নাম?

জবাব এলো—অংরেজী!

অংরেজী! নামের কি ছিরি। এই নাম যিনি রেখেছেন, নিশ্চয় তিনি ইংরেজ আমলের পুরানো লোক। ইংরেজ ভক্ত। ইংরেজের সঙ্গে-সাথে ফিরে দিল্লী-বোম্বে-ব্যাঙ্গারে ইংরেজ সরকারে কাজ-কাজ কিছু করেছেন। এই অঞ্চলে কখনও ইংরেজরা এসেছে মনেই হয় না—সুতরাং জানকী চটি; নিশ্‌নি, বাড়িয়াতে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়ে কারও পক্ষে এই নাম রাখার কথা ভাবাই যায় না। শুধু হিমালয় কিংবা গোটা ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবীতে কোন মেয়ের নাম যে অংরেজী, কেউ বোধহয় ভাবতেই পারে না।

অংরেজীর বয়স যোল, রং দুধে-আলতায়, গাল আপেল-লাল। ওর সূক্ষ্ম সিঁথির দুপাশে কপালের চুলগুলো ঢেউ খেলতে খেলতে এগিয়ে লম্বা জুলপির শেষপ্রান্তে গিয়ে মনোরম বাঁক নিয়েছে। ভাগ্যিস, মেয়েরা জুলপি ছাঁটকাট করে না! ওর নাকের ঠিক নিচেই মসুরি সাইজের আঁচিলটি দেখলে মনে হয়, অমন নিভাঁজ সুন্দর মুখে ঐ কলঙ্কচিহ্নটি না থাকলে সব সৌন্দর্য বোধ হয় খোলতাই হত না। কালো যে মাঝে মাঝে আলো বানায় এই ছোট্ট আঁচিলটুকু বোধ হয় তারই বাণীরূপ। অংরেজীর বুক থেকে ক্রম-অধদেহের নিখুঁত বর্ণনা না করেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, ওর দেহে এমন আগুন আছে যা হিমালয়ী ঋষিদের ধ্যান ভাঙাবার পক্ষে যথেষ্ট।

অংরেজীর পোশাকী বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে না পড়ে যায় না—ওর কোমরে বারো হাত কাপড়ের বেল্ট নেই। উর্ধ্বাঙ্গে রয়েছে মানানসই জ্যাকেট, ক্ষীণ কটিতটে কুচিহীন ঘাঘরা—নিতম্ব লেপ্টে তা আবার

পায়ের দিকে ঝুলে আছে, অনেকটা স্কার্ট আর ঘাঘরায় কম্প্রোমাইজের মতো। মজার কথা, মেয়েদের ব্লাউজ এখানে রীতিমতো মহিলীয়, বঙ্গীয় ব্লাউজের মতো অমন মারাত্মক রকমে খাটো নয়। আমেরিকায় অনেক মেয়ে গরমকালে এই ধরনের ব্লাউজ-কাম-জ্যাকেট-কাম-শার্ট পরে—কোমরের ইঞ্চিখানেক উপর পর্যন্ত তার ঝুল প্রলম্বিত থাকে বলে পেট-পিঠের ইঞ্চিখানেকের বেশি উলঙ্গ থাকে না ; সুতরাং উলঙ্গ রাণী শিরোনামে তাদের নিয়ে কাব্য রচনা করাও চলে না।

হিমালয়ের এই অঞ্চলে মেয়েরা লিপস্টিকে ঠোঁট রাঙায় না। তার কারণ এই নয়, মনে মনে এদের সন্ন্যাস নেবার বাসনা আছে। দোকান যা আছে, তাতে চাল-ডাল-তেল-নুন-সবজী ছাড়া তেমন কোন অন্য চীজ পাবার উপায় নেই বললেই চলে—লিপস্টিক তো নয়ই। অবশ্য সুযোগমত যারা নিচে থেকে আনিয়ে নেয়, তাদের কথা আলাদা। বিনা লিপস্টিকে মেয়েদের ঠোঁট যে লাল-লাল দেখায় তার কারণ, সবাই দন্তধাবণ করে, আখরোটের ডাল দিয়ে ; আমাদের নিমের ডালের মতো আর কি। মেয়েদের ঠোঁটে লালের ছাপ কিছু বেশি থাকে—সম্ভবত আখরোট রসের লাল ছোপকে গাঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী করার কায়দা তাদের জানা আছে। অংরেজীর ঠোঁট দেখে মনে হল, কায়দাটি সে ভালভাবেই রপ্ত করেছে। পুরুষের চোখে নিজেকে মনোলোভন করে প্রতিভাত করার প্রবণতা মেয়েদের সবার মতো অংরেজীরও একই। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বেচ্ছা-সেবিকার মাথার টুপির মতো অংরেজার মাথায় এতক্ষণ টুপি ছিল। টুপি খুলে এবার সে আমাদের মাঝখানে বসে পড়ল।

অংরেজী অদূর রাণা গাঁয়ে হাই ইস্কুলে পড়ে। এরই মধ্যে বিয়েও হয়ে গেছে। বর ওর চাইতে মোটে তিন বছরের বড়, পেশাও তার আর পাঁচজন পাহাড়ী মানুষের মতো—লাঙল টেনে জমি তৈরী করে দেওয়া, ফালতু কিছু রোজগারের ধান্দা করা, খাওয়া-শোওয়া-ঘুর ঘুর করে ঘোরা। লেখাপড়া জানা সুন্দরী সুবেশা অংরেজীর মনে হয়তো বাড়তি কিছু রসটস আছে—চালে-চেহারায় তো তাই মনে হয়।

ভাবতে যেন বেখাপ লাগে, এই অংরেজী জমিতে গিয়ে গম কাটবে, পিঠে ঝুমনী বোঝা নিয়ে পাহাড়ের ধাপ বেয়ে নেমে ঘরে ফিরবে, ভাত রেঁধে ভাতারকে খাওয়াবে! সে যাই হোক, এখন তো মনে হয়, ওর চোখে মুখে বর এবং ঘর পাওয়া একটি তৃপ্তির ছাপ লেগে আছে!

ষোড়শ বর্ষীয়া অংরেজী গাঁয়ের ছোকরাদের মনে যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে তা বোঝা গেল বুদ্ধি সিং-এর কথায়—'অংরেজীকে দেখলেই একটু গায়ে হাত দিতে ইচ্ছা করে', আমার জন্য আখরোট গাছের ফুল পাড়তে যাওয়ার পথে বুদ্ধি সিং বলে—'ওর ঠোঁটে একটু—'

আমি চমকে উঠি। আখরোট-পাইন-দেওদার বনচারিণী হিমগিরিনন্দিনীর নাম কেন অংরেজী তার সঙ্গত ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি। মাত্র ষোল বছর বয়সে অংরেজী যে এমন রাজকীয় সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে উঠবে এবং তাকে দেখলেই যে বুদ্ধি সিং-এর মতো ফক্কর ছোকরারা গায়ে হাত দিতে চাইবে, ভাল মানুষ সেজে জয় সিং-এর ঘরে অংরেজীর কাছাকাছি বসবে, রাধিকা, দ্রৌপদী, জয় সিং-রা কেউই তা ভাবেনি। ধরমশালার ব্যবসায় বুদ্ধি সিং হচ্ছে জয় সিং-এর চৌদ্দ অংশীদারের একজন—বাড়ি তার যমুনার ওপারে হিমালয় শিখরের বানোশ গাঁয়ে। কিন্তু সারাদিন কাটে তার হনুমান চটিতে। এবং ছুতো পেলেই বাড়িয়ায় গিয়ে জয় সিং-এর বাড়িতে হাজির হয়। এক ফাঁকে তখনই হয়তো অংরেজীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ করে নেয়।

'তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড আছে?' আমি স্পষ্ট জিজ্ঞেস করি। বুদ্ধি সিং সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে প্রতিবাদ করে বলে—নাহ্। পরে অবশ্য স্বীকার করে—বোধ হয় মেয়ে-বন্ধু থাকার মধ্যে যে একটু হিম্মত, একটু গৌরব আছে, তাই প্রকাশ করতে। বুদ্ধি সিং আপনা থেকেই গড়্ গড়্ করে জানায়, মেয়েটির নাম গৌতমী, বয়স সতেরো, পাঁচ বছরের বন্ধুতা।

'আর বাড়ি, তার বাড়ি কোথায়?'

'আজ্ঞে বানোশ গাঁয়ে। আমাদের ঘরের সঙ্গেই ঘর।'

'তোমার মা বাপ কি বলেন', আমি জিজ্ঞেস করি—'বিয়েতে তাদের মত আছে তো?'

'কি যে বলেন স্যার', বুদ্ধি সিং জবাব দেয়—'মা বাবা তো সব সময়ই বলে—দুটিতে বেশ মানায়।'

হিমালয়ের এই অঞ্চলে বিয়ের ব্যাপারটা ভারতের অন্য সব ভারতীয় লোকের বিয়ের মতই সনাতনপন্থী—মা বাবার মনোনীত পাত্রপাত্রীর মধ্যে মালাবদল হয়। অবশ্য ছুপা-রুস্তম অনেক আছে। তারা লুকিয়ে প্রেম করে। এবং তা প্রকাশ পেলে কেউ বাধা না দিয়ে বিয়ে দেয়। 'চাচা আপন চাচী পর তার মেয়েকে বিয়ে কর্' শ্লোগান হিমালয়ে অচল, তবে মামাতো ভাইবোনে বিয়ে ঠিক চলে। 'চাচাতো ভাইবোন কেন নয়' আমি জিজ্ঞেস করি। 'বারে' বুদ্ধি সিং অবাক হয়ে বলে—'তাও কখনও হয়? চাচাতো বোন তো আপন বোনই।'

'ভাবী বধূর সঙ্গে মাঝে মাঝে তোমার মোলাকাত হয় বটে তো?' বুদ্ধি সিং-এর গার্ল ফ্রেণ্ড প্রসঙ্গ আবার তুলে আমি বলি।

বুদ্ধি সিং হাসে, হেসেই বলে—'সুযোগ পেলেই ওকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যাই। দুতিন ঘণ্টা পর ফিরে আসি।' আমার চোখ মুখ লক্ষ্য করে বুদ্ধি সিং আবার বলে—'কেউ কিচ্ছু টের পায় না স্যার। গৌতমী বহুৎ চালাক ছোকরী।

গৌতমী আর বুদ্ধি সিং যখন মা বাপ হবে, নিজেদের সোমত্ত মেয়েকে নিশ্চয় চোখে চোখে রাখবে, খবরদারি করে বলবে—সাবধান, জঙ্গলে যেওনি!

বাড়িয়া গাঁয়ের একটি ছেলের আজ ভোরেই বিয়ে হয়ে গেছে, দূরবর্তী ঐ তিন পাহাড়-ঘেরা নিশনি গাঁয়ে। কাল সন্ধ্যায় বাড়িয়া থেকে বরাত গিয়েছিল নিশনিতে। একান্নজন বরযাত্রী কনের ঘরে পৌঁছেই প্রথমে সারে মিষ্টিমুখ পর্ব। তারপর চা বিস্কুট খেয়ে অবশ্যই এলাচ সুপুরি মুখে দিতে হয়েছে। এলাচ সুপুরির ব্যবস্থা না থাকলে বিয়ে বাড়ির মনে থাকে না। রাত ৯টা বাজতে না বাজতেই

এবার ভোজ—খাঁটি ঘিয়ের হালুয়া, পুরী। সঙ্গে গেলাস গেলাস শরাব। থোয়া বহুৎ মদফদ না পেলে সবার ভোজের স্বাদ নাকি মাটি হয়ে যায়!

কাল বরবধূর চারি চক্ষুতে মিলন ঘটেনি। মন্ত্র পড়ে আজই ভোরে বিয়ে হয়ে গিয়েছে—সকাল আটটায় ওরা বেদীর চারপাশে সাত পাঁক ঘুরেছে। সন্ধ্যায় নববধূকে নিয়ে বর আসছে আপন ঘরে। রাধিকারা আমাকে বলেছিলেন বটে, এবার বরাত আসবে। তখন বাজি পুড়বে। বৌভাত হবে। বরের বাড়িতে সবাই খাঁটি ঘিয়ের হালুয়া, পুরী পেট পুরে খাবে। সবার হাতে আবার গেলাস উঠবে। শরাবের! ভোজের আসরে আমার নেমন্তন্নও ছিল—দুঃখের বিষয়, থেকে যাওয়া সম্ভব হল না। হিমালয়ের গ্রাম দেখা হয়ে গিয়েছে, লোকজন, জমিজিরেতও দেখে নিয়েছি। অনেকের সঙ্গেই আলাপ-সালাপ হয়েছে। বৌ-ভাত খেয়ে রাতের পাহাড় ঠেলে হনুমান চটিতে ফেরা আমার সম্ভব নয়—ওদের অনুরোধ রেখে বাড়িয়াতে যে রাত কাটিয়ে যাব তারও উপায় ছিল না। হনুমান চটিতে আজ আমাকে ফিরতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ওখানেই ওরা আমাকে বরবধূর মুখ দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিশনি থেকে বাড়িয়ায় ফিরতে হনুমান চটি ছাড়া কোন পথ নেই বটে তো!

হিমালয়ী বিয়ে সম্বন্ধেও অনেক কথা শোনা হল। আগে মেয়ের বাবাই পণ নিতেন। এখন পণ মিলছে বরের বাবার নয়; তার ছেলের—ঘড়ি, আংটি, স্যুট, পালং, কুরসি, বিস্তরা। গাঁয়ের লোক মিলেও ভাল উপহার দেয়—চার মণ গম আর চৌলি। ধুতি। বর্তন। বৌ-ভাত খেতে এসেও সবাই বৌয়ের হাতে টাকা দেয়—পাঁচ থেকে দশ টাকা।

এই অঞ্চলে বিজলী বাতি নেই। কয়লা বা গ্যাসের খনিও নেই। বর আসবে বলে বরাতের লোকেরা হাই পাওয়ারের হ্যাজাক জ্বেলে রাতকে দিন করে রেখেছে। না করে উপায় ছিল না। হনুমান চটি হচ্ছে আসা-যাওয়ার পথের মাঝে অপেক্ষা-স্থল। এখানে

পাল্কিবাহকদের কাঁধবদল ঘটে, বর এবং বরযাত্রীদের মনে পালাবদল ঘটে—যুদ্ধজেতা রমণী-রত্ন নিয়ে এইমাত্র যেন শত্রু-এলাকা পার হয়ে আসা গেছে; এবার আপন এলাকা—নিরাপদ, নিঃশঙ্ক, নিরুদ্বিগ্ন।

ছিপছিপে জোয়ান সুপুরুষ বর সুন্দর সিং বীরভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে—কোমরে প্রলম্বিত তরবারি, হাতে ঢাল, কড়ে আঙ্গুলে রক্তচিহ্ন—দলবল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে যেন এই মাত্র তার কবল থেকে কেড়ে এনেছে রমণী-রত্ন, তার ললাটে এঁকে দিয়েছে রক্ততিলক। পরাজিত পর্যুদস্ত শত্রুর রক্তে।

সুন্দর সিং-এর ডাইনে নাইলনের ঘেরাটোপ দেওয়া ছোট্ট পাল্কিতে মুকুট-শোভিতা রক্তাম্বর-ভূষিতা ঘোমটা-পরা নববধূ বসে আছে। হনুমান চটির মাঝপথে কারও পক্ষে ঘোমটা হটিয়ে নববধূর মুখ দেখার উপায় নেই। তবু পরদেশী আমার খাতিরে বৌয়ের ঘোমটা গেল খুলে, কন্যাপক্ষের পাণ্ডা (পুরুত ঠাকুর) বড় মুখে বললেন—'ছাখো বাবুজী, ভাল করে দেখে নাও—বৌ তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!'

পাণ্ডার কথা একটুও মিথ্যা নয় দেখছি!

তখন বরযাত্রীরা তালে তালে নাচছে ট্যুইস্ট নাচের মতো নাচ। স্থানীয় কিছু যুবক এগিয়ে গিয়ে হাত পেতে বরের কাছে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দাবি করল। ভারত সর্ববিষয়ে সর্বত্র এক। এবং অদ্বিতীয়। অবশ্য বিদেশেও বরের গাড়ি থামিয়ে পাড়ার ছোকরাদের টাকা আদায় করতে দেখেছি।—অস্ট্রেলিয়াতে ওরা মদের পয়সা আদায় করে নেয়। সেখানে বোতলম্ ইতরে জনাঃ!

সুন্দর সিং-এর বিয়ের যে চিঠি আমরা পেয়েছিলাম তা নিয়ে সম্ভাব্য কৌতূহল মেটাতে অবিকল সেটি তুলে দিচ্ছি:

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ

মান্যবর,

শ্রীমতী ও শ্রী তারাচাঁদ পাঙোয়ার অপনি সুপুত্রী আয়ু (আয়ুষ্মতী এই অর্থে) জ্ঞান দেবী

এবং

চি (অর্থাৎ চিরঞ্জীব) জগমোহন সুপুত্র শ্রীসুন্দর সিং রাবত, নি (নিবাসী অর্থে) গ্রাম বাড়িয়া কে শুভ পাণিগ্রহণ সংস্কার পর আপকো কারিক্রম অনুসার সাদর নিমন্ত্রিত্ করতে হ্যাঁ।

স্থান ঃ

গ্রাম নিশনি পট্টিগিট,

উত্তরকাশী।

বিনীত ঃ

প্রেম সিং পাঙোয়ার

মোহন সিং পাঙোয়ার

শুরবীর সিং পাঙোয়ার।

এবার আমরা গঙ্গোত্রীর পথে এগিয়ে যেতে বসেছি। এডমণ্ড হিলারি বলেছিলেন বটে, একবার উৎস পর্যন্ত চলে যাও—তখন বুঝবে গঙ্গা মানুষকে কেন টানে। কিন্তু আমরা তো আর গঙ্গাসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে তাঁর মতো একেবারে হিমালয় পর্যন্ত গঙ্গার ধারা অনুসরণ করিনি। আমাদের গঙ্গামূর্তি আসলে পাসপোর্ট ফটোর মতো—শুধু মুখের ছবি। তাই যে শুধু দেখতে পাব—সেকি আর কম কথা! পথে পথে ছিঁটেফোঁটা গঙ্গা যা দেখছি, তা তো ফাউ!

হনুমান চটিতে আবহাওয়া এখন সুবিধার নয়। ঝড় বইছে—অবশ্য ঝড় নয়, ঝড়ো হাওয়া। পাহাড়ী গাছের ছোট ছোট ফুলন্ত ডালের সতেজ পত্রাবলী লাল লাল ফুলগুলোকে হাওয়ার তোড় থেকে রক্ষা করে চলেছে এক বিচিত্র কায়দায়—ডিগবাজি খেয়ে উঠে ফুলগুলোকে ঘিরে থেকে। ঝাউবনেও মাতন লেগেছে—পাইন, মরু, খরসু, বাজ,

রৌদ্র, বুরান গাছের পাতা থর থর করে কাঁপছে। ওদিকে যমুনার গর্জনে ঘাটতি বৃদ্ধি নেই, ঝরণার পতনে কোন ছন্দবিকৃতি নেই। হনুমান চটি ছেড়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম, এমন পরিবেশের জুড়ি কি কোথাও দেখেছি!

হনুমান চটি থেকে ধারাসু পর্যন্ত নেমে এসে পূবের পথে আমরা এলাম উত্তরকাশীতে; তারপর আবার উত্তর-পূর্বদিকে এগিয়ে লঙ্কায় অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর প্রান্তসীমায়। সব মিলিয়ে দু'শ আঠারো কিলোমিটার পথ।

এবার পথ ছিল অনেক ভদ্র, বাড়িঘর চোখে পড়ছিল ঘন ঘন; গরু চরছে, বোম ভোলানাথের মতো মোষেরা মুখ উঁচিয়ে তালকানার মতো ঘুরছে, ছোট ঝরণায় জল ঝরছে বেলোয়ারি ছন্দে। সারা হিমালয় জুড়ে দেওদার বনের ছায়া দোলে; এই দিকে কিন্তু অনেক বেশি ঔদার্যে। টিটিভ্ পাখিরা চির্ র্ করে ডাকে—বনমর্মরে সে ডাক মিলিয়ে যায়। লোকালয় কোলে হিমালয় এখানে শুধু কাছে নয়, সবার নিত্য ছায়া-সঙ্গী। এখানে চলতে পথে মটরশুঁটি পা জড়িয়ে ধরে গাঁয়ের রাখালকে বলে না—একটু খেলা করে যা, ভাই। তবু পাহাড়ের ছায়া, ঝরণার ছন্দ, বনের মায়া মানুষের মনে সাড়া জাগিয়ে কথা কয়ে ওঠে।

এবার বড়ই গরম দিচ্ছে, লোক আইঢাই করছে—এরই মধ্যে আবার গাড়ির এঞ্জিন গরম হয়ে উঠে বরাদ্দের বেশি জল দাবি করছে। কিন্তু বাড়তি জলই বা কোথায়—কাছাকাছি কোন ঝরণা চোখে পড়ছে না। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার নিস্পৃহ নিরাসক্তে মাটিতে বসে পড়ল—যেন কিছুই হয়নি। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—একটা ছুরি চাই; আর যেখান থেকেই হোক, জলের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। যে সব বুদ্ধিমান যাত্রী প্লাস্টিকের পাত্র ভরে জল সঞ্চয় করে রেখেছিল তারা নিজেদের কথা না ভেবে, কিংবা বেশি করে ভেবেই আপন আপন জলপাত্র এগিয়ে দিল। কিন্তু জল আর এঞ্জিনে ঢুকছে কোথায়—কাটা পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটি ছুরিও এগিয়ে

দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ড্রাইভার নিতে ভুলে গিয়েছে। ধমক দিয়ে বলা হল, 'নেই মাঙতা কিয়া?' কাচুমাচু হয়ে সবিনয়ে ড্রাইভার বলল—'নেই মহারাজ!' ফের ধমক দিয়ে বললাম—নেই মহারাজ! মহারাজ বললেই বুঝি সব কসুর মাফ হয়ে যায়, তাই না! সারাটা বাস খল খল করে হেসে উঠল। যেন কতই হাসির কথা!

ভন মুলার এবং রোজা আমাদের বাসেই গঙ্গোত্রী যাচ্ছে। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মুলার গঙ্গোত্রা দেখতে চলেছে। ভন মুলার হঠাৎ একটি আশ্চর্য কথা বলে ফেলল—'ভারতের রেলে উঠে বসলে গোটা ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করা যায়, বাসে কিংবা পায়ে হেঁটে হিমালয়ে ঘুরলে ভারতের ধর্মচেতনাটিকে ধরতে পারা যায়।' ওর প্রথম মন্তব্যে আমি সেণ্ট পারসেণ্ট একমত হয়ে দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে বললাম—'কিন্তু সর্বসাধারণ সব যাত্রীই কি ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ? বোধ হয় না। সারা জীবনের পাপকর্মের দীর্ঘ তালিকা অনেকের মনেই তৈরী করা থাকে।' তীর্থের জলে সেই পাপ-ভার ডুবিয়ে দিয়ে পুণ্যের বোঝা নিয়ে তারা ঘরে ফিরতে চায়!'

আমার কথা শুনে ভন মুলার চিন্তিত হাসি হাসল, রোজা হাসল কিছুই না বুঝে, কারণ আমার বলার ভাষা জার্মান ছিল না। ভন মুলারের জার্মান-অনূদিত 'পাপ-কর্মের দীর্ঘ তালিকা' শুনে রোজা যেন কিছু গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণে আবার হাসল বটে, তবে এই হাসি আর আগের হাসিতে ছিল বিস্তর তফাত।

এবার আমি আরও একটু কথা বাড়িয়ে বলি—'ভারতবর্ষ সত্যের দেশ, ধর্মের দেশ, মহান দেশ। কত ধর্মবেত্তা, ধর্মগুরু ভারতে জন্মেছেন, বেদ-বেদান্ত গীতা-উপনিষদ ভাগবত-পুরাণ রচনা করেছেন, যার দুর্গপ্রাকার ডিঙিয়ে চন্দ্রযুগের পণ্ডিতরা না তার অর্থ খুঁজেছেন, না নিজেরা নতুন কিছু বলতে পেরেছেন।'

ওদের নীরব শ্রোতা পেয়ে আমার বক্তব্য বেড়েই চলে। মুলারদের

সঙ্গে কথা বলার মজা এই, ওরা প্রতিবাদ করে কম, শোনে বেশি। ওরা ভারত নিয়ে যেমন পড়াশুনা করেছে, তেমদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব লক্ষ্য করে ভাখে, বিশেষ করে এদেশের ধর্মের বাহ্যিক দিকগুলো। 'ভারত-ভ্রমণ নিয়ে বই লিখতে গেলে এসব না করলে চলে,' ভন মুলার বলে—'কেবল হালকা কথায় তো আর আমার কাহিনী ভরিয়ে দিতে চাই না।'

'আজও ভারত কত মহান দেশ ভাখো', এবার আমি বলি—'স্বাধীন ভারতের রূপকাররা ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রথে চড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, ভারত কেমন সেকুলার—'

এবার আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার চেষ্টা করি, কারণ ধর্মের কথায় মতভেদ দেখা দেবে অনেক, সমাধান মিলবে কম। হঠাৎ ওঠে কলকাতার কথা।

কলকাতা সম্বন্ধে ভন মুলার যা বলে, তা শুনে আমি হতবাক হয়ে যাই—'কলকাতার বাসের জুড়ি সারা পৃথিবীতে সত্যি নেই; একই দরজা দিয়ে লোকে ঢোকে আর বেরোয়—তার উপর আবার সেখানে তুইজন কণ্ডাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে, নইলে নাকি গাড়ি চালানো যায় না। কত আর বলব—বাস ছাড়তে, বাঁধতে কণ্ডাক্টর ঘন্টি না বাজিয়ে বাসের টিনে চাটি মারে, মুখে বিকট শব্দ করে বলে—হো-ঐ! অনাবশ্যক চেঁচায়। একে তো মুর্গী-ঠাসা ভিড়—তার উপর এই অশান্তি তোমরা সহ্য কর কি করে? কি করে সহ্য কর কণ্ডাক্টরদের দুর্ব্যবহার—গন্তব্যে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তারা চেঁচায়—জলদি, জলদি; নেমে যান নেমে যান; যেন বিনা পয়সার অবাঞ্ছিত লোকদের হটিয়ে দিচ্ছে।'

'কোন্‌টা রেখে কোনটা বলব', ভন মুলার বলতে থাকে—'পাকা সড়কে গর্ত খুঁড়ে লোকে খুঁটি পোঁতে, পুজার সময় প্যাণ্ডেল করে। খোলা সড়কে নাগাজ পড়ে। কেউ কিচ্ছু বলে না। প্রতিফুট রাস্তা তৈরী করতে এখানে কত খরচ পড়ে বলতে পার?'

আমি বললাম—'শ' কয়েক টাকা তো বটেই।'

'অবেই আখো', ভন মুলার সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে— 'তোমাদের লোকগুলো একেবারে ক্রুট। বর্বর। নইলে কি আর ফুটপাতে শাবল ঠোঁকে, ফুটপাতে বাচ্চা পয়দা করে লোকসংখ্যা বাড়ায়।—মজার কথা, সারাটা দেশে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

শুধু ভন মুলার নয়, সব বিদেশীই কলকাতার সব কীর্তি লক্ষ্য করে, বাগে পেলেই আমাদের নির্মম রকমে শুনিয়ে দেয়। সম্প্রতি জাপানে গিয়েও আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। কলকাতা-ফেরত এক জাপানী ভদ্রলোক আমাকে তার বাড়িতে বসিয়ে চায়ের কাপ হাতে দিয়ে কলকাতার হকার, ফুটপাতের দোকান, প্রস্রাবাগার ইত্যাদি নিয়ে যে সব কথা বলেছিলেন, তা শুনে আমি মরমে মরে গিয়েছিলাম। অথচ বলার বা করার কিছু আমার ছিল না।

গঙ্গোত্রীর পথে এবার চোখ ফেরানো যাক। অনেকটা আমরা এগিয়ে এসেছি। হনুমান চটির পর ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত যমুনা ছিলেন চোখে চোখে, এবার গঙ্গা ধারাসু থেকে উত্তরকাশী হয়ে একেবারে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বিরাজিত রয়েছেন আমাদের চোখের সামনে। উত্তরকাশী থেকে আর চুয়ান্ন কিমি উজান পর্যন্তই মাছের বাস। তারপর গঙ্গোত্রী পর্যন্ত আর মাছ নেই। খরস্রোত, কঙ্করীগর্ভ, পাষাণী বাঁক—মাছেরা কি করেই বা শান্তিতে বাস করবে, নির্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করবে।

মে মাসের উত্তরকাশীতে বেশ গরম পড়েছে। সদ্য মুকুলিত আম গাছ প্রচুর রয়েছে। কিন্তু এখানে লোকের আমের চেয়ে আপেল নিয়ে গর্ব বেশি। উত্তরকাশীর শিউরতন বললেন—'এখানকার আপেল তো খাননি বাবুজী—একেবারে আপেলের রাজা। কাশ্মীরী আপেল এর কাছে নস্যি।' শিউরতন আরও বলতে লাগলেন— 'বেশি নয়, উত্তরকাশী থেকে মোটে আঠারো কিমি যেতে হবে— রেথেল, ভারোয়ারি, জারমেলা পর্যন্ত, ব্যস। কৃষকদের আসল শস্য কি জানেন? আপেল। গমের চাইতে বেশি পয়সা দেয়।' তা দিক,

আমি বলতে বলতে চেপে গেলাম—কাশ্মীরের কাছে উত্তরকাশীর আপেল আর ভাল কোথায়!

উত্তরকাশীর 'রোহু মাচ্ছি' সম্বন্ধেও শিউরতন লম্বা সার্টিফিকেট দিয়ে বললেন—'মাত্র চব্বিশ টাকা কিলো। বাঙ্গালিবাবুদের জন্য কি আর বাজারে পড়তে পারে।' আমি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—দ্বিধা, ত্রিধা বিভক্ত অপ্রসর খাত; ঘোলা জলের বিষম স্রোত এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এখানকার বড় কথা আপেল, গঙ্গানদী, রুই মাছ নয়; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা চীন সীমানা—এখান থেকে মাত্র দেড়শ মাইল দূরে।

হিমালয় জুড়ে কত বৈচিত্র্যই চোখে পড়ছে—টিহ্‌রি থেকে হনুমান চটি, তারপর আবার ভায়া ধারাসু উত্তরকাশী এবং শেষ পর্যন্ত গঙ্গোত্রী জুড়ে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। আগে হিমালয় জুড়ে ছিল অথৈ জল। তারপর হঠাৎ একদিন সমুদ্রের জায়গায় ভগবান হিমালয় খাড়া করে দিলেন।

দিনের পর দিন সমুদ্রের উপর দিয়ে এগোও—শুধু জল আর জল। ঝড় উঠল তো জলগুলো সব ঢেউ হয়ে গেল—বসে বসে কত দেখবে, কত ঢেউ গুণবে! আবার শান্ত সাগরে ভেসে চল—এখানে ওখানে কিছু উড়াল মাছের ঝাঁক, দু'চারখানা জাহাজ, এক আধ টুকরো ভাসন্ত কাঠ, নয়তো কিছু বীয়ার ক্যান চোখে পড়বে। বড় জোর কোথাও ছিঁটেফোঁটা দ্বীপ। ব্যস। কিন্তু এসব কিছুই যদি চোখে না পড়ে? তাহলে শুধু জল আর জল—কত আর দেখবে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ক্লান্তিতে ভরে যায়। সমুদ্রের গাম্ভীর্য এবং গভীরতা নিচে, দৃষ্টির বাইরে। উঁচু হবার পথ সাগরের নেই। ঢেউ-গুলো কুড়ি, কিংবা তিরিশ, কিংবা চল্লিশ ফুট উঁচু হলেই আমরা বলি —পাহাড়প্রমাণ!

হিমালয়ে চলুন—বাঁকে বাঁকে তার বৈচিত্র্য—পাথরগুলো কোথাও সাদা সাদা, কোথাও লাল লাল, কোথাও ঝামা ঝামা; আবার কোথাও খাঁজ-কাটা খাড়াপাহাড়ের বিস্ময়—কোথাও তার

ক্রমে চালে বিলয়। কোথাও অন্ত নেই—একটা পেরিয়ে যাই তো আরেকটা চোখে পড়ে। তার গাছপালায় লতাপাতায় রংবৈচিত্র্যেও অন্ত নেই। পাহাড়ে মোষ চড়ছে তো গরু দাঁড়িয়ে হাম্বা হাম্বা ডাকছে। সাগরে কোথায় এই বৈচিত্র্য! টিহরি থেকে হনুমান চটি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, কেদার বদরী জোড়া বিস্তৃত অঞ্চলে লক্ষ্য করে দেখুন—সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে ক্ষেতে কাজ করে কাঁধে বোঝা বয়ে ঘরে ফিরছে। আপনার মনটা বলবে—তাই তো!

এই হিমালয়ে এগিয়ে চলতে আপনার মনে হবে, এই এগিয়ে যাবার একটা যেন মানে আছে, হিমালয়ে আপনার একটা 'মিশন' আছে—মনে হবে, বোধহয় কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আপনি হিমালয়ের পথে পথে এগিয়ে চলেছেন!

বিকেল চারটা বেজে গিয়েছে। এবার আমরা লঙ্কায়। এ শ্রীলঙ্কা মোটেই নয়, বিশ্রী লঙ্কা। চারদিকে কেমন যেন একটা নৈরাশ্যের ছাপ; ধূলিমলিন ছায়া-ছায়া পরিপার্শ্ব। গোটা কত ব্যারাক, চাল-চেহারার অনুপাতে অনেক মাঙ্গা কটি গেস্ট হাউস এবং ধরমশালা, কেনেস্ত্রা টিনের কিছু চায়ের স্টল—এই নিয়ে লঙ্কা। রাবণ রাজার সঙ্গে এই লঙ্কার কোন সম্পর্ক নেই, রামচন্দ্রের সঙ্গেও না—যদিও হনুমান চন্দ্রের নামের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে গাড়োয়ালী হিমালয়ের সর্বত্র। লঙ্কার ওপাশ ফিরলেই গঙ্গা, কিন্তু গঙ্গোত্রী কম পক্ষে বারো কিলোমিটার দূরে।

লঙ্কার চেহারা চরিত্র দেখে ওখানে রাত কাটাবার ইচ্ছা উবে গেল; শুরু হল আমাদের পদযাত্রা। গঙ্গার খরস্রোত আর পর্বত-গাত্রবিঘর্ষণচঞ্চল কলকুটিল জল দেখতে দেখতে দেড় কিমি বিষম খাড়া চড়াই, দেড় কিমি উৎরাই পেরিয়ে ভৈরবঘাঁটি পৌঁছে শুনতে পেলাম, গঙ্গোত্রী যাবার অন্য কোন যাত্রী নেই; কাজে কাজেই কোন বাস ছাড়বে না—আসল কথা, গঙ্গোত্রী থেকে আজ আর কোন বাস ফেরত-যাত্রী নিয়ে ভৈরবঘাঁটিতে আসবে না। সুতরাং ছাড়ার প্রশ্ন

আর কোথায়? ভৈরবঘাঁটির চেহারা আবার লঙ্কার চেয়ে অধম। সুতরাং রাতের আশ্রয় ভৈরবঘাঁটিতে নেবার প্রশ্নও বাতিল করে দেওয়া হল। যানবাহনের মধ্যে একটা নড়বড়ে জিপ মিলল। ষাট টাকা ভাড়া কবুল করে জিপে চেপে যখন নয় কিমি পথ পেরিয়ে গঙ্গোত্রী পৌঁছে গিয়েছি, রাতের অন্ধকার তখন বেশ ঘন হয়ে উঠেছে।

ভন মুলাররা ভক্ত গোছের যাত্রী। হিমালয়ের কোন স্থানই তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর কিংবা অশ্রদ্ধেয় নয়—রাতের মতো তারা ভৈরবঘাঁটিতেই রয়ে গেছে। কোন্ স্থানের কোন্ মাহাত্ম্য কি করে তাদের মনকে শ্রদ্ধাবনত করে তারাই জানে। আপাতত আমরা ক্ষুৎপিপাসায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাবার হোটেল খুঁজতে গিয়ে দেখা হল এক বঙ্গসন্তানের সঙ্গে। কলকাতাবাসী বাঙাল। 'আসুন, আসুন,' আপাত উষ্ণতায় স্বাগত জানিয়ে বঙ্গসন্তান এক ছাপড়া ঘরে আমাদের ডেকে এনে বলল—'এখাকার মতো ভাল খাবার এই অঞ্চলে আর কোথাও পাবেননি, স্যার! গঙ্গার ঘোর গর্জনে চালাঘরের হোটেল তখন থর থর করে কাঁপছে—মনে হচ্ছে যেন খাড়া তীর থেকে ড্রাইভ দিয়ে পড়ল বলে! ওবেলার বাসি ভাত, কাঁচা দালদা-ঢালা ডাল, আর আলুচচ্চরি পেটচুক্তি পাঁচ টাকায় কিনে খেয়ে মনে হল, এত খারাপ খাওয়া জীবনে কখনও খাইনি! পরে শুনলাম, বঙ্গসন্তানটি এক নিদারুণ টাউট—খদ্দের জুটিয়ে দিয়ে হোটেল থেকে কমিশন খায়! ব্যাপারটি আমাদের কিছু হতভম্ব করে, কারণ বাংলার বাইরে বাঙালিকে এই ভূমিকায় কখনও দেখি নি। এ যেন ওড়িয়া-বেহারিদের মতো কোন পাঞ্জাবী সর্দারকে কুলীগিরি করতে দেখা!

রাত্রিবাসের জন্য গিয়ে উঠেছিলাম কালীকমলী ধরমশালায়। ঠাঁই মেলেনি। যে ঘর মিলতে পারত, তা প্রায় বাসের অযোগ্য। শেষপর্যন্ত ওরাই বললেন একবার ভাণ্ডী আশ্রমে গিয়ে ঢুঁ মারতে—ঘর খালি থাকলে যে মিলবে ওরা নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন। ভাগ্যিস, এই আশ্রম, এবং ধররশালাগুলো সেবা-প্রতিষ্ঠান—নইলে যাত্রীদের

অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কি নিদারুণ কালোবাজারী, অভাবনীয় দুর্নীতি যে চলত, তা কল্পনাই করা যায় না। যে দেশে খুচরো পয়সা বাজার থেকে হটিয়ে নিয়ে বছরের পর বছর লোকে বিনা শাস্তিতে একশ টাকায় বেচে আশী টাকার খুচরো, সেখানে সিটের খাকতি ঘটিয়ে দুর্গম হিমালয়ে ব্যবসা করা অসম্ভব ছিল না। এই আমাদের ভারতবর্ষ। এইখানে এখনও লোকে ধর্মের ধার ধারে। বিনা স্বার্থে তীর্থযাত্রীদের সেবাপ্রতিষ্ঠান খুলে খেদমদ করে!

ভাণ্ডী আশ্রম আসলে শঙ্করাচার্য আশ্রম। সেখানে আশাতীত আশ্রয় মিলল—তোষক-চাদর-লেপের পরিপাটি বিছানা, পরিচ্ছন্ন বাথরুম, ড্রামভরা জলের সংস্থান। বৈদ্যুতিক আলো। এ যে গতানুগতিক ধরমশালার তুলনায় রাজসিক ব্যবস্থা। তা আবার গঙ্গোত্রীর ঠিক গা ঘেঁষে আশ্রমের অবস্থান। মনে হল, বোধহয় অনেক পুণ্যি জমা ছিল।

রাতের আঁধারে কাল গঙ্গোত্রী খুঁটিয়ে দেখার উপায় ছিল না। ভিড় জমার আগে ভাল করে গঙ্গোত্রী দেখব বলে সকাল সকাল আশ্রম থেকে বেরিয়েছিলাম। দেখছি, আমাদের চেয়ে চতুর লোক পৃথিবীতে আছে—তারা আমাদের আগেই এসে পৌঁছে গেছে।

ডাইনে বাঁয়ে সামনে তিন তিনটি বিশাল পর্বত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার মাঝে নুড়িবিছানো পাথর ছড়ানো ক্রম-ঢালু একটি প্রশস্ত মাঠ—তারই উপর দিয়ে এলোমেলো জলস্রোত বয়ে চলেছে। পতিতপাবনী গঙ্গার শুরু এইখানে—এই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম গঙ্গোত্রী। গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের পুরাণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এখানে বোধহয় অনাবশ্যক, কারণ একথা প্রায় কারও অজানা নয়। কপিল মুনির শাপভস্ম ষাট হাজার সগর সন্তানকে সঞ্জীবিত করতেই রাজা ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন—ভোলা মহেশ্বর গঙ্গার সুতীব্র ধারা মাথা পেতে গ্রহণ করেন, ভাগীরথ আগে আগে পথ দেখিয়ে একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নিয়ে চলেন গঙ্গার ধারা। কোথায় কোন্ পাহাড়ের চাতালে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মহাদেব স্বর্গের সুরধুনী ধারা

মাথায় ধারণ করেন, ভগীরথ ঠিক তখন কোথায় শঙ্খহাতে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সব কথা গঙ্গোত্রীতে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু বলে দেবার তো কেউ নেই। মনে হয়, যদি উপযুক্ত যোগবল থাকত, যোগবলে জানা যেত সেই সব আশ্চর্য কথা!

পুরাণ কাহিনীর পুরাণত্বের মর্ম যাই হোক, আমাদের ভাবতে রোমাঞ্চিত বোধ হয়, গঙ্গার একটি বড় অংশ বাংলার উপর দিয়ে প্রবাহিতা। শুধু উৎস থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার ধারাকে যে ভাগীরথী বলে তা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করেছি। অথচ ছেলেবেলার ভূগোলে আমরা মুখস্থ করেছিলাম—গঙ্গানদী যেখানে বাংলায় প্রবেশ করেছে, সেইখান থেকে তার নাম ভাগীরথী!

গঙ্গোত্রীতেই ছিল আদি গোমুখ—তারপর ক্রমে তুষারাবৃত পাহাড়ের রাজ্য। পাঁচ হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর সর্বত্র উষ্ণতা বেড়েছে, এই অঞ্চলেও বরফ গলে গলে পাথুরে পাহাড় প্রকট হয়ে পড়েছে, স্বভাবতই তুহিনাবৃত বর্তমান গোমুখ সরে গিয়েছেন পনেরো কিলোমিটার উপরে। সেইখান থেকে আসছে জলের ধারা। তীর্থের পুণ্যকামীদের অনেকে তাই সেইখানে ছুটে যায় বর্তমান গোমুখ দেখতে—তা না দেখলে নাকি তীর্থ হয় না! কিন্তু আরও হাজার কি দু'চার হাজার বছর পরে পৃথিবী আরও গরম হতে থাকলে গোমুখ তো পড়ে থাকবে আরও দূরে—গঙ্গোত্রী হয়তো আরও নিচে হটে যাবেন। তখন? সে কথা তখনকার লোক ভেবে দেখবে! তীর্থের মন নিয়ে যদি এখন গোমুখ দেখতে হয়, গোমুখের কথা ভেবে শিহরিত হতে হয়, গঙ্গোত্রী-গোমুখের অধুনালুপ্ত স্থানটিই তো আসল কথা!

গঙ্গোত্রীতে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে গঙ্গামূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেই মূর্তি নিত্য পূজিত হচ্ছেন। হিন্দুর দেবদেবী স্বর্গলোক থেকে মূর্তি ধরে মর্ত্যে নেমে আসেন; গুণকর্মের হিসেব অনুসারে ভক্তের কল্পনায় তাঁর মর্ত্যরূপ পরিকল্পিত হয়। সরস্বতী নদীতীরে সুপ্রাচীন ভারতের মুনিঋষিরা বীণা বাজিয়ে সামগান করতেন। একদিন তাঁরা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা করে বসলেন—

তাঁর হাতে উঠল বীণা, সামবেদগান করা যন্ত্রের প্রতীক। দেবীর রং কল্পিত হল সাদা—প্রকৃত বিদ্যালাভ হলেই তো কলঙ্কশূন্যতা জন্মে, যার অর্থ শুভ্রতা। আর বেদী সরস্বতী তো স্বয়ং বিদ্যার মূর্তি—শুভ্রবরণী না হলে চলে! ভারতীয়রা বলে তিনি শাড়ি পরিহিতা—শাড়ির রঙে সামান্য নীলের ছোপ আছে। সরস্বতী নদীর জলের রং আর কি! মানস সরোবরের উৎসমুখে যখন পদ্মফুলের অভাব নেই, তখন দেবীর আসনে পদ্মফুলে ভূষিত কর। তোফা সব কল্পনা! রবীন্দ্রনাথও দেবীবর্ণনায় লিখেছেন—

বিমল মানস সরসবাসিনী
শুক্লাবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিনী
কমল কুঞ্জাসনা!

স্বচ্ছন্দ সুগন্ধি পুষ্পে পূজা পেয়ে সুপক্ক ভোগ খেয়ে আমাদের দেবদেবীরা পাথর হয়ে বসে থাকেন না, ভক্তের ডাকে সাড়া দেন—চোখের সামনে তাঁর আবির্ভাবও ঘটে পূজিত মূর্তির রূপ ধরে। মৃন্ময়ী মা কালী চিন্ময়ীরূপে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখা দিতেন, তাঁর সঙ্গে কথাও বলতেন। দক্ষিণেশ্বরে সেই কালীমূর্তি এখনও আছেন। হিমালয়ের এক শৈলশিখরে স্রোতবতী গঙ্গার জলধারার পাশে গঙ্গামূর্তিতে ফুল ছিটিয়ে ভক্তরা ভাবে না, পাথর পূজো করছে—বিশ্বাস করে, মাহাত্ম্যঘন মূর্তিমতী গঙ্গাকে চোখের সামনে দেখে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করছে। কথাগুলো যার উদ্দেশে বলা, সেই ভন মুলার সব শুনে বলল—'হিন্দুধর্মের বেশ কিছু বই পড়ে হিন্দুর অনেক আচার-উপচার হৃদয় দিয়ে বুঝতে শিখেছি, বৈদিকযুগ জীবনধারা আমার কাছে অর্থবহরকমে প্রতিভাত হচ্ছে।'

আমি বললাম—'আগের কোন জন্মে নিশ্চয় তুমি ভারতে জন্ম নিয়েছিলে। হিন্দুর ঘরে।'

অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ভন মুলার বলল—'তোমাদের জন্মান্তরবাদও কিন্তু এবার আমি মানতে চলেছি।'

গঙ্গোত্রী দেখে আবার আমরা ভাণ্ডী আশ্রমে ফিরে এসেছি। খেতে এবং বিদায় নিতে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য কেদারনাথ, তারপর বদরীনাথ। সারা হিমালয় জুড়েই তো শিবের রাজ্য। ভগবান শঙ্করাচার্য শিবের সাক্ষাৎ-অবতার বলে স্বীকৃত। কেদার-বদরীর কথায় শঙ্করাচার্যের প্রসঙ্গে কিছু উত্থাপন করতে হবে বৈকি। গঙ্গোত্রীতে ভাণ্ডী আশ্রম খুলে শঙ্করাচার্য-সম্প্রদায় তীর্থযাত্রীদের আন্তরিক সেবা করে চলেছেন। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

ভাণ্ডী আশ্রমে খাওয়া-থাকায় পয়সা লাগে না। তবে সেবার নামে প্রায় সবাই কিছু দান করে যায়, বিশেষ করে হোটেল, আশ্রম বা ধরমশালায় থাকা-খাওয়ার সম্ভাব্য অঙ্কটা তো বটেই। উঠানময় চত্বরে লাইন করে পাত পেতে সবাই খেতে বসেছে—দুই জোড়া বৃটিশ নর-নারী, একজন অস্ট্রেলিয়ান, এক জোড়া জার্মান লোকও আছে। শানের 'পরে জোড়াসন হয়ে বসে চাপাতি, মোটা চালের ভাত, ডাল, আলুঝিঙের ঘ্যাঁট সবাই সোনামুখ করে খাচ্ছে।

কাছেই হাত-মুখ-বাসন ধোয়ার জায়গা। নির্দিষ্ট স্থান থেকে থালা গেলাস উঠিয়ে নিয়ে অতিথিদের খেতে বসতে হয়, খাওয়ার পর ধুয়ে আবার একই জায়গায় সাজিয়ে রাখতে হয়। ওখানেই একটা ইংরেজ ছেলেকে শুধালাম—সামান্য ডাল-ভাত খেতে পারলে? ইংরেজসুলভ অভ্যেসে ছেলেটি মুখস্থের মতো বলল—'খুব ভাল খেলাম।' বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম, এটা ওর মনের কথা নয়, মন আর মুখ ওদের প্রায় কখনই এক নয়। ওরা রেখে-ঢেকে মুখ খোলে।

অস্ট্রেলিয়ার ছেলেটি ভারতে দুবছর যাবত আছে, যোগ শিক্ষা করতে। 'ইণ্ডিয়ার সাধুরা সবাই মেকী,' ছেলেটি বলল—'তারা কিছুই জানে না।' আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম—'তবু কেন দীর্ঘ দুবছর তাদের পেছনে ঘুরছ?' অস্ট্রেলীয় চুপ। ভারত এবং ভারতবাসী সম্বন্ধেও ওর ধারণা খুব শোকাবহ—'ভারতীয়রা বড় অলস, নোংরা, কপট। মন্ত্রীরা চোর, গুণ্ডাপোষক, অর্থ এবং গদী-গৃধ্নু'। ইত্যাদি।

মুখ মুছতে মুছতে শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবরা সবাই চলে গেল। মুফতের খানা খেয়ে এবং বিনা ভাড়ার ঘরে রাত কাটিয়ে। 'এখানে থাকতে খেতে পয়সা লাগে না শুনে ওরা সবাই আসে,' আশ্রম-কর্তা বললেন—'এবং তার ষোল আনা সুযোগ নেয়। শুধু কি তাই', তিনি আরও জানালেন—'ওরা বড় অসংযমী—এক ঘরে দুই ছেলে, তিন মেয়ে, কিংবা তিন মেয়ে চার ছেলে মিলে নির্লজ্জের মতো থাকে। যুবতী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে নাকি তীর্থ হয়! ভাবছি, এবার আমাদের কিছু শক্ত হতে হবে।'

'শীতকালের কথা বলছ,' আমার প্রশ্নে স্বামীজী বললেন—'তখন গঙ্গোত্রীর লোকসংখ্যা এক, বড় জোর দুজন। এই আশ্রমের লোক। মরসুম সময়ে গঙ্গোত্রীতে এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়।'

এবার আমাদের কেদারের পথে এগিয়ে যেতে হবে। গঙ্গোত্রী থেকে ন' কিমি মোটরে, তিন কিমি হেঁটে যখন ফের লঙ্কায় এসেছি, তখন আড়াইটে বেজে গিয়েছে, এগিয়ে যাবার জন্য ভদ্রমত কোন টুরিস্ট বাস নেই। শেষ পর্যন্ত পেলাম একটি লোক্যাল বাস। টায় টায় ঠাসা। তাতেই কোনমতে দাঁড়িয়ে থেকে নব্বুই কিমি নিচে নেমে এসে উত্তরকাশীতে রাত্রিবাস করতে হল। এখানকার ধরমশালায় বেজায় ভিড়। গঙ্গাতীরের শহরকেন্দ্রে যে বিড়লা ধরমশালাটি রয়েছে, তার ঘর প্রতি ভাড়া আট টাকা, চারজন তাতে থাকাও যায়—কিন্তু খাট নেই, বিছানাপত্র কিছুই নেই; বাড়তি আরও উৎপাত আছে—রোজ আট আনা ভাড়ার যাত্রীরা বারান্দায়, ঘরের আনাচ-কানাচে এমন ভিড় জমিয়ে পড়ে থাকে, কল-পায়খানার অবস্থা এমন শোচনীয় করে তোলে, যে নড়াচড়ার উপায়ই থাকে না, বসবাস কা কথা! দুন এক্সপ্রেসে দেখেছি, মুখ ধোওয়ার বেসিনে লোকে দাঁতন কাঠি, চায়ের ভাঁড় ফেলে রাখে, অথচ জানালা গলিয়ে এগুলো অনায়াসে বাইরে ফেলে দেওয়া যায়! এমন দেশে লোকের

নাগরিক কর্তব্য জাগিয়ে তুলবেন কি করে ? 'চাবুকের জোরে'—কেউ কেউ ক্ষেপে গিয়ে মন্তব্য করেন !

উত্তরকাশীতে রাতটি ভালই কেটেছিল। মাথাপিছু পনেরো টাকায় অঢেল আলো-জল-হাওয়া এবং রুচিসম্মত শয্যাসহ যে ঘর পেয়েছিলাম, তাকে বেশ-ভাল বলতে দোষ নেই। শুধু খাওয়া নিয়ে আমাদের খুঁত খুঁত ছিল। কারণ শহরের হোটেলগুলোয় ভাত ছিল না, মুগমুসুরের বদলে চৌলি ফুটিয়ে ডাল রান্না করা, সবজী বলতে শুধু আলু, আলু আর আলু ! খাওয়া-খরচও আকাশ-ছোঁয়া। মুরগীর ঝোল, আণ্ডা-কারি, পাঁঠার ডালনাও মেলে, তবে সুলভ নয়। জেলা-শহর বলে উত্তরকাশীর কিছু ঠায়-ঠমক আছে, চৈনিক বর্ডার কাছে বলে সৈনিক তৎপরতা আছে, গঙ্গা দূরে নয় বলে কেউ ফিরেও তাকায় না। এভারেস্টচারিণী বাচেন্দ্রির বসবাস উত্তরকাশীতে বলে এখানকার সবাই খুব শিহরিত। কুমায়ুন মণ্ডলের পিথরাগড়ে বাচেন্দ্রির আপন ঘর।

গঙ্গোত্রীর পথে উত্তরকাশীতে নেমে দৌড়ে চলে গিয়েছিলাম নদীর ধারে। ছবি তুলতে। আবার যে এখানে আসতে হবে জানা ছিল না। হিমালয়ের যেখানেই গঙ্গাযমুনা প্রবাহিতা এবং যেখানেই পুল রয়েছে, বিনা অনুমতিতে ছবি তোলা সেখানে নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞার মূল্য আছে। সুখের কথা, লোকে তা মেনেও চলে। এবার ছবি তুলতে গিয়ে কিছু নতুন সমস্যা দেখা দিল—চ্যাংড়া চ্যাংড়া ছেলেমেয়ে কেবলই বলেছিল—বাঙ্গালিবাবু, আমার একটা ছবি নাও। আশ্চর্য, গায়ে নাম লেখা নেই, তবু ওরা বোঝে আমরা কোথাকার লোক—শুধু ধরতে পারে না, আমরা পদ্মার হে-পার কিংবা এপারের।

উত্তরকাশী ছাড়ার পর ভায়া টিহরি একেবারে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত নেমে এসেছি। ভাগীরথী এতক্ষণ ছিলেন আমাদের বাঁয়ে, আমাদের চোখের কাছে কাছে। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে তার সঙ্গম ঘটতেই ভাগীরথী নাম গেল ঘুচে, নাম হল তার গঙ্গা।

ঋষিকেশ, হরিদ্বার কাশী-প্রয়াগ-ফরাক্কা হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করলেন বাংলায়।

দেবপ্রয়াগ আর রুদ্রপ্রয়াগের মাঝামাঝি একটি জায়গার নাম শ্রীনগর। অলকানন্দার তীরে। শ্রীনগরে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, নাম তার ইউনিভারসিটি অব গাড়োয়াল। এইখানে একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে এসে বাসে উঠল, শশী আর বিজয়। ভাইবোন। শশী শ্রীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের এম-এতে শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, দাদা বিজয়ের সঙ্গে। বিজয় একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বটানিতে পি-এইচ-ডি করে। শশীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এক মিলিটারি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। বাপ-মায়ের কাছে দু'চারদিন থেকে শশী চলে যাবে স্বামীর ঘরে। রাঁচীতে।

বিজয় বলিষ্ঠ গঠন যুবক। দীঘল গড়ন। চোখমুখ বিদ্যার দীপ্তিতে ভাস্বর। শশীও দীর্ঘাঙ্গিনী, রঙের আরক্তিম আভায়, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে সোনার প্রতিমার মতো জ্বল জ্বল করে। ভাইবোন দুজনেই বেশ ভদ্র, মার্জিত, কথায়বার্তায় সংযত। বাংলা মুল্লুক নিয়ে বিজয়ের পড়াশুনা বেশ গভীর, বিশেষত বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বিষয়ে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র, জগদীশ বোস-মেঘনাদ সাহা বাঙালি হলেও পৃথিবীর গর্ব, বিজয় কেড়িয়া মন্তব্য করে—'আমাদের পরম সৌভাগ্য, বঙ্গভূমি ভারতের মধ্যে; আমরা তাঁদের তাই ভারতীয় ভেবে গর্ব করতে পারি। বাংলায় আজ যাই ঘটুক না কেন,' বিজয় আরও জানায়—'গাড়োয়ালের এই সুদূর প্রান্তে বসে আমরা আজও বিশ্বাস করি, বাংলা ভারতকে আবার নেতৃত্ব দেবে। সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব।'

টিহরির এক নগণ্য হোটেলের কথা আমার মনে পড়ল—তার নগণ্যতর ভোজনগৃহে আমি দুটি ক্যালেণ্ডার দেখেছিলাম—একটি সমরসজ্জায় নেতাজী, অপরটি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের; মা-খা, মা-খা বলে মাকালীকে রেকাব থেকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন।

অলকানন্দার অমন সুন্দর নাম—তার সঙ্গে আবার একটি

ধর্মচিন্তাস্ফুচিত স্বর্গীয় ভাবের রেশ জড়িয়ে আছে। অথচ জল তার প্রচণ্ড ঘোলা। বালুকীর্ণ। ক্ষীণ কলেবর বলে উদ্দাম। অলকানন্দার কর্দমাবিল জল দেখলে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় না—নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

বেলা তিনটে বেজে গিয়েছে, বাস এসে থেমেছে রুদ্রপ্রয়াগে। নামের সঙ্গে স্থানটির বেশ অর্থ-সামঞ্জস্য আছে—এখানকার আকাশ-মাটি-হাওয়ার মধ্যে একটা যেন রুদ্ররূপ বিরাজ করছে। এবার আরও একটি নদীর ধারা চোখে পড়ছে, নাম তার মন্দাকিনী। জল কাদা-গোলা। তীর বালুকীর্ণ। ছন্দ জটিল। রুদ্রপ্রয়াগে সঙ্গম ঘটেছে অলকানন্দা-মন্দাকিনীর। বদরীনারায়ণের উপরে অলকাপুরীর বাঁক—সেইখানে অলকানন্দার জন্ম। কেদারনাথ থেকে উঠে এসেছেন মন্দাকিনী। স্বর্গের নদী বলে তুইয়েরই নাম আছে।

সঙ্গম পেরিয়ে মন্দাকিনীর জলের রং বড় মধুর; মনোহারী হাল্কা সবুজ। মনে হয় যেন পাষাণ-হৃদয় ভেদ করে মন্দাকিনী করুণাধারায় বইছেন। হঠাৎ-হঠাৎ বাঁক-নেওয়া মন্দাকিনীর মিহি বালুকীর্ণ প্রসন্ন-শুভ্র বেশ-প্রশস্ত তটভূমি দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

রুদ্রপ্রয়াগে একটি ব্যাপার ঘটল—বাস থামিয়ে জনস্বাস্থ্য বিভাগের লোক সবার কাছে প্রমাণ দেখতে চাইলেন, কলেরার টিকে নেওয়া হয়েছে কিনা। সমতল থেকে উপরে এসে পাহাড়ী লোকদের মধ্যে কলেরার বীজ ছড়িয়ে যাবে? সেটি হবে না। প্রমাণ দেখাও, নইলে আপিসে এসে টিকা নিয়ে যাও—সোজা কথা! 'কিন্তু এখেনে টিকে নেওয়া মানে কি জান,' এক অভিজ্ঞ ভদ্রলোক বললেন—'হাত টেনে নিয়ে ওরা ভোতা-মার্কা ভোমা ভোমা স্ঁচ ঢুকিয়ে দেয়, যেন গরু-মোষের গায়ে ইনজেকশন দিচ্ছে। এবার তুমি বেদনায় কাতরাও, জ্বর হয়ে মর—কার পিতৃদেবের কি!'

আমাদের ব্যক্তিগতভাবে শঙ্কিত হবার কোন কারণ ছিল না, কারণ বুদ্ধিমানের মতো কলকাতা থেকে প্রমাণপত্র আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। একদল লোককে টিকে নেবার জন্য এগিয়ে যেতে

দেখে মনের শান্তি কিছু বিঘ্নিত হল—ওদের ইনজেকশনজনিত ক্লেশকর আগামীকালের কথা ভাবতে লাগলাম।

লোকগুলো ফিরে আসতেই বললাম—খুব লেগেছে বুঝি?

'দূর মশয়', তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন—। মাথাপিছু দু'টাকা করে দিলাম, ব্যস। এই দেখুন, ওরা টিকা-নেওয়া সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে! হঠাৎ হিসাবের খাতা বের করে পড়তে শুরু করলেন তার সদ্যরচিত একটি কবিতা—

চলে যাও বঙ্গে, কাঞ্চী কি কলিঙ্গে
ঘুষ আর বজ্জাতি চলে সাথে সঙ্গে!

আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে গিয়েছি—আহা, পথে পথে সে কি আমগাছের সার। গাছে গাছে মার্বেল-খেলা গুলির মতো আম গুঁটি বেঁধেছে। এর পর আরও বড় হবে, আঁটি বাঁধবে। পাকবে। ছেলেবেলার কথা এখনও মনে পড়ে। আমে আঁটি হবার আগেই আমরা পেছু লাগতাম, লক্ষ্যভেদী ঢিল ছুঁড়ে ফুট-কাঁচা আমগুলো পেড়ে মনের সাধ মেটাতাম। পরের গাছের আম, চ্যাংড়া চ্যাংড়া সব ছেলে—পরস্পরের মধ্যে যেন চুম্বকের টান ছিল। এখন হাসি পায়।

কাছেই অগস্ত্য আশ্রম রয়েছে। এই আশ্রমের সঙ্গে মুনি-প্রবরের কি সম্পর্ক কেউ বলতে পারল না। দু'হাতের অঞ্জলিভরে জল তুলে অগস্ত্য মুনি একদিন সাগর শোষণ করেছিলেন। মন্দাকিনীর ক্ষীণ জলধারায় তাঁর কি তৃষ্ণা মিটত!

বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। আমরা গুপ্তকাশীতে পৌঁছে গিয়েছি। দুই পর্বতের মাঝে সুগভীর খদ। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে আর ভরসা হল না—যেন গাড়ির স্টিয়ারিং আমার হাতে এবং এই মুহূর্তে বিশেষ সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে; নইলে এখনই গাড়ি খদে পড়ে যাবে। আমরা সবাই যেন ফুটবল মাঠে দর্শক—খেলি না, তবু বিশেষ বিশেষ উত্তেজক মুহূর্তে অজ্ঞাতে পা উঠে। তখন আমরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। আমরা সবাই তখন খেলোয়াড়!

গুপ্তকাশীতে ভগবান শিবের মন্দির আছে। কুরুক্ষেত্রের পর কেদারের পথে ঘুরতে ঘুরতে পাণ্ডবরা এখানেও এসেছিলেন। শিব তখন কাশীতে, সুতরাং গুপ্তকাশীতে অপ্রকট। তাই এর নাম গুপ্তকাশী। এখানকার লোকে তাই বলে।

শিবঠাকুর নয়, কুরুক্ষেত্রের অনাচার-অনুতপ্ত এবং মনের শান্তি-সন্ধানে হিমালয়-পরিব্রাজক পাণ্ডবদের নিয়েও নয়, তখন তর্ক চলছিল অগস্ত্যকে নিয়ে। 'সব গুল মশাই, স্রেফ গুলোলজি, রুদ্রপ্রয়াগে কলেরার ভূয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহকারী বঙ্গসন্তান বললেন—'একজন মানুষ কখনও একটা সমুদ্রের জল খেয়ে শেষ করতে পারে?'

'গুলোলজি নয় মশাই, মিথোলজি', অপর বঙ্গসন্তান সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন—'মিথ মানেই তো মিথ্যা। ইংরেজী আর বাংলায় কেমন সোন্দর মিল, তাই না!'

এবম্বিধ বাদপ্রতিবাদের সময় আমি মুখ তুলে পার্শ্ববর্তী ছেলেটির কাল-ঘুম ভাঙিয়ে বললাম—'অগস্ত্য কে ছিলেন গো?'

'কে জানে মশাই', হাই তুলে হাতে তুড়ি মেরে ছেলেটি পরম ঔদাস্যে বলল—'এখন তো ঐ নামে ওখানে কোন লোক নেই!'

গৌরীকুণ্ডে যখন বাস থেকে নেমেছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা বেজে গিয়েছে। চারদিকে ঘন অন্ধকার। সরু গলিপথের দুধারে সারি সারি দোকানে ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। খুব কাছেই মন্দাকিনী গর্জন করছেন। এবার রাতের মতো আমাদের একটি আশ্রয় চাই—অথচ কোথায় যেতে হবে, আশ্রয় কোথায় মিলবে কিছুই জানি না। ঠিক তখন এক ভদ্রলোক বোধহয় অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বুঝেই পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'ভারত সেবাশ্রম সংঘে চলে যাও।'

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল—বন্যায়, দাঙ্গা-দুর্গতিতে, মানুষের সব রকম আপদ-বিপদে সংঘ-সাধুদের সেবাপরায়ণতার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা লক্ষ্য করে আমার আগেই

ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সেবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই পুণ্য সংঘের নাম আশ্চর্যরকমে সার্থক। ভারত সেবাশ্রম সংঘের নিকট-সংস্পর্শে বলতে গেলে আজই এলাম। হিমালয়ে এসে এই সংঘের নাম আগে যে কেন মনে পড়েনি সেইটেই আশ্চর্য।

মন্দাকিনীর পারে ছোট একটি পাকা বাড়ি—ঢুকতেই ব্রহ্মচারী দেবনারায়ণ স্মিতহাস্যে বললেন—আসুন, আসুন। তাঁর স্বাগত আহ্বানে উষ্ণতা লক্ষ্য করে মনে হল, যেন অনেকদিন পর একটুখানি আত্মীয়তার স্পর্শ পেলাম। ঘরে তখন হারিকেনের আলো জ্বলছে, পাশের ঘরে ঠাকুরের আরতি হচ্ছে; এ পাশে ঘরের খানিকটা অংশ পর্দায় ঘিরে আশ্রমী সাধুদের জন্য রান্না চলছে। বাজার-হাঁট, রান্নাবাড়া, ধোয়া-পাকলা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিজেরা করেও সাধু-সন্ন্যাসীরা পরহিতে ব্রতী রয়েছেন—এই সুদূর হিমালয়ে বসে তীর্থকামীদের সেবা করে চলেছেন, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করেই। মানুষের অনন্ত স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে এ এক আশ্চর্য আইডিয়া!

ফরাস-পাতা গদীতে কম্বল-গায়ে দেবনারায়ণ বসেছিলেন; ভাল করে লক্ষ্য করে আমাদের দেখে বললেন—'খুব শীত লাগছে বুঝি, একটা কম্বল দেবো?'

ঘর, বিছানাপত্র সবই আমাদের দেওয়া হয়েছে; সব গোছগাছ করে রেখে পাশের হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলাম—ডাল, আলুভাজা, আলুপোস্ত, বাঁধাকপির ডালনা। সুপ্রিয়া নামে বাঙ্গালি হোটেলে বঙ্গীয় রান্না!

কাল ভোরে আমাদের রওনা হতে হবে কেদারনাথের পথে। চৌদ্দ কিলোমিটার চড়াই-উৎরাই পথ; জিপ, বাস, মোটর গাড়ি সেখানে অচল—হেঁটে যাও, নয়তো মানুষ-ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে উঠে বসে পড়। কোথায় ওসব পাবে? ভারত সেবাশ্রম সংঘই সব ব্যবস্থা করে দেবেন—ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডি, সব। ঝুড়িতে বসে মানুষের কাঁধে চড়ে-যাওয়া ব্যবস্থার নাম ডাণ্ডী, চার সোয়ারিবাহিত কাষ্ঠাসনের নাম কাণ্ডী। কাণ্ডির খরচ খুব বেশি, আড়াইশ টাকার

কাছাকাছি। যানবাহনের ব্যবস্থাদি করে দেবনারায়ণ বললেন—'তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন—ভোরে উঠে চান করে তবে রওনা হতে হবে।

হাড়-কাঁপা শীতে ভোর চারটেতে চান করা! 'কোন কষ্ট নেই', ব্রহ্মচারী আশ্বাস দিলেন—'কাছেই গরম জলের কুণ্ড রয়েছে—অসুবিধা কোথায়?'

আশ্চর্য, প্রকৃতি আপন হাতে কেমন নিখুঁত সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দশহাত দূরে মন্দাকিনীর বরফ শীতল জলধারা বইছে। ওখানে চান করলে রক্ষা নেই; হয়তো জমে যেতে হবে। তারই জন্য জীবের প্রতি এই করুণা। এই বিবেচনা। এর উপর আবার মানুষের করুণা তো আছেই। সাধু-মহাত্মাদের করুণা। জ্বর, সর্দি, রক্তচাপে কষ্ট পাচ্ছেন? ভারত সেবাশ্রম সংঘে একজন ডাক্তারবাবু রয়েছেন—যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে তিনি ওষুধ দিচ্ছেন। বিনা পয়সায়। ডাক্তারবাবুও বঙ্গ-সন্তান। সেবাধর্মে উদ্দীপিত। পরিণত বয়সে মন্দাকিনীর ধারে পড়ে আছেন মানবহিতায়। ভারত সেবাশ্রম সংঘই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাস্থ্যের প্রতি ভারত সেবাশ্রম সংঘের এতো নজর। এতোই তাদের দরদ। অথচ কোন প্রচার নেই, বই পত্রিকা ছেপে নিজেদের মহৎ মর্মের জয়ঢাক পেটানো নেই। তবু অনাহূত, রবাহূত মানুষ এখানে আসেন। সংঘকর্মীদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত নিজেরাও সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হন—আপন সাধ্যে অনেকেই দানধ্যান করে যান! তাতেই সংঘের অনেক কাজ হয়। সংঘের তো কোন আয় নেই—আপনার যা-হোক-কিছু দান না পেলে চলবে কেন!

এখানকার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বস্তু গৌরীকুণ্ড—ছোট্ট একটি চৌবাচ্চা। পারগুলো শান বাঁধানো। কেমন যেন তার হলদে মতো জল। মাঝে মাঝে নাকি জলের রঙ-বদল ঘটে—কখনও দুধের মতো সাদা হয়ে যায়, কখন আবার লাল-লাল, কিংবা হলদে

মতো। ভারত সেবাশ্রম সংলগ্ন গৌরীকুণ্ডে নিত্যপূজা লেগে আছে; সেখানে ফুলের অর্ঘ্য নিত্য নিবেদিত হচ্ছে। কারণ এটি ছিল উমার তপস্যা ক্ষেত্র। শিবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য হিমগিরি-নন্দিনী হৈমবতী একদিন ক্ষেপে উঠেছিলেন; শেষ পর্যন্ত এইখানে স্থির হয়ে বসে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। সেয়ানা মেয়েই বলতে হবে, জায়গাটিও বেছে নিয়েছিলেন ভালই—চারধারে সুউচ্চ শৈলমালা, পাশ দিয়ে মন্দাকিনী কলনাদিনী। কে জানে, তপস্বিনীর ধ্যান না ভাঙিয়ে মন্দাকিনী হয়তো বা আপন তাল-লয়-ছন্দে ধ্যানের মধ্যেই তার মনকে নিবিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

বর হিসেবে চির জোয়ান শিব ঠাকুর মন্দ নয়—পর্বতচারিণী একটি ডানপিটে মেয়ের মনে লাগার মতই বটে। অবশ্য আমাদের চোখে বরের গুণ-গৌরবে কিছু ঘাটতি ধরা পড়ে—পোশাক-আসাক তেমন সুবিধার নয়, গায়ে ছাইভস্ম মাখা, গলায় সাপ-পেছানো। সঙ্গী আবার মস্ত একটি ষাঁড়। তাতে অবশ্য পার্বতীর কিছু আসে যায় না, কারণ যার সাথে যার মজে মন—এই শিবকে সোয়ামী করার জন্য তিনি দুস্তর তপস্যা করেছেন, এইটেই তাঁর কাছে বড় কথা। তাঁর তপস্যার জোরে শিবের টনক নড়েছে; তিনি সামনে এসে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু শুভকার্যটি গৌরীকুণ্ডে না হয়ে সমাধা হয়েছে মাইল ছয়েক দূরে, ত্রিযুগী নারায়ণে—সে-পথ আমরা আগেই পার হয়ে এসেছি। ত্রিযুগী নারায়ণের অল্প দূরে আজও একটি ধুনী প্রজ্বলিত আছে—আসলে হোমাগ্নি; শিব-পার্বতীর বিয়ের দিন থেকে জ্বলছে। এই যজ্ঞ শিখা হয়তো চিরকালই জ্বলতে থাকবে।

একটি গোলমেলে প্রশ্ন এখন অনেকেই তোলে—হরিদ্বারের অদূরে কনখলে ছিল পার্বতীর বাবা দক্ষরাজার বাড়ি। সেইখানে কোথাও নিরিবিলি বসে দেবাদিদেবের ধ্যান করাই তো ছিল স্বাভাবিক। কনখলের লোকের সঙ্গে কথা বলুন—তারা জোরের সঙ্গে সেই মত সমর্থন করে। কিন্তু আরও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা আছে—ভাবী জামাতা-বাবাজীর চালচলন দক্ষরাজার মনের মতো

বিবেচিত না হবারই আশঙ্কা ছিল, অন্তত রাজকন্যাটিকে যে তার হাতে তুলে দেওয়া যায় না তাঁর মনে সেই চিন্তার উদয় হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তারই জন্য তপস্যা করতে দেখলে পার্বতীকে মা যে পোড়ারমুখী বলে গাল দেবেন তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। এ সব কথা দক্ষরাজ-তনয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল বলেই তিনি কনখলের বাপের বাড়ি থেকে পাঁচশ মাইল দূরে সাড়ে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় বসে শিবের তপস্যা শুরু করেছিলেন—ঐ অঞ্চলে যে শিবের আনাগোনা ছিল সে খবর নিয়েই শিবানী ঐখানে চলে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে হচ্ছে—কনখল দেখে কিন্তু আমাদের মনে হয়নি, একটি সোমত্ত মেয়ের পক্ষে ঐখানে কোথাও বসে মা-বাবার চোখে ধূলো ছিটিয়ে অবৈধভাবে শিব ঠাকুরের ধ্যান করা সম্ভব!

এবার আমাদের নিজেদের কথায় ফেরা যাক। ভোরের দিকে আমরা রওনা হয়েছিলাম কেদারনাথের পথে। শুরুতেই মনে পড়ে গেল পটে-আঁকা মহপ্রস্থানের ছবির কথা—বাঁয়ে সুগভীর খদ, ডাইনে সুউচ্চ পর্বতমালা; খদের ধার বরাবর সরু সড়কটি সামনে এগিয়ে গিয়েছে পাহাড়ের পায়ে পায়ে। চড়াইপথে পাণ্ডবেরা এক এক করে এগিয়ে চলেছেন। উপর দিকে হিমালয়ে। মহাপ্রস্থানের পথে।

আমরা কেদারের পথে এগিয়ে চলেছি—কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ মানুষের পিঠে। চড়াই থেকে উৎরাইয়ে নেমে সুবিপুল বাঁক ঘুরতে গিয়ে পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে অগ্রবর্তীদের—সবাই যেন মহাপ্রস্থানের যাত্রী। পাহাড়ের গুহায় সাধুরা আস্তানা গেড়ে বসে আছে—কাছে শিব-কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পট, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। তীর্থযাত্রীরা সাধুদের প্রসারিত হাতে সিকিটা-আধুলিটা দিয়ে যাচ্ছে। দানের এই পয়সা না পেলে সাধুবাবাদের দিন চলে না, কারণ সাধুদের জঠরের জ্বালা অসাধুদের তুলনায় একটুও কম নয়। তার উপর গাজা-ভাঙের অভ্যেস অল্প-বিস্তর সবারই রয়েছে। নইলে আবার সাধু কিসের! ভাগ্যিস

সাধুবেশী এই ভিক্ষাজীবীদের কোন বোস্টমী নেই—অন্তত চোখে তো পড়ল না—নইলে হিমালয় জুড়ে ভিক্ষান্নজীবী খুব বড় একটি সাধুবংশ সৃষ্টি হয়ে যেতো।

চার কিমি পথ অতিক্রমের শেষে অনেকেই সকালিক চা খাওয়ার সুযোগ করে নিয়েছে। সাধুর আস্তানার মতো পাহাড়ী-পথের মাঝে মাঝেই চা পাওয়া যায়, বিস্কুট-পকৌড়া-তেলেভাজা মেলে। দাম খুব বেশি, এই যা! চায়ের কাপ তো আশি পয়সার কমই নয়। 'কেন নয়', চাওয়ালা বলে—'সবই তো নিচে থেকে আনতে হয়।' অবশ্য বাড়তি চাহিদাও দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ—তীর্থের মরসুম সময়ে চাহিদা যতো বাড়ে, দাম ততই বাড়তে থাকে। দুটো ফালতু পয়সা কামিয়ে না নিলে বেকার ছ'মাসে খাবটা কি—এই তাদের যুক্তি।

কি বিপুলসংখ্যক যাত্রী যে কেদারের পথে এগিয়ে চলে, চৌদ্দ কিমির চড়াই এবং উৎরাই নিজে ভেঙে, চলন্ত মিছিল দেখে কিংবা অন্যের মুখে ঝাল খেয়েও সবটা কল্পনা করা যায় না। যাত্রা শুরু হওয়া ভোরে একদিন গৌরীকুণ্ডের অদূর সড়কে চলে আসুন—মাইলটাক সড়ক জুড়ে এত অসংখ্য, এত অগণিত, এত অগণনীয় ঘোড়া-গাধা-খচ্চর দাঁড়িয়ে থাকে, বহনযোগ্য লোকের অপেক্ষায় এত ডাণ্ডী-কাণ্ডি-আসন দেখা যায়, ঐ এক মাইলের ঘিঞ্জিজট ভেদ করে কারও এগোবার উপায় যে থাকে না, নিজ চোখে দেখতে পাবেন।

ঘোড়া যখন মানুষ-পিঠে চড়াই থেকে উৎরাইয়ে নামে, হাঁ করে তা দেখবার মতো। গুরুভার বহনের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসে আছে—সুতরাং চোখ মেলে ভাল করে সামনে দেখে নিয়ে ঘোড়া পা বাড়ায়, পা টিপে টিপে এগোয়, যাতে পদচ্যুতি ঘটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে গভীর খাদে পড়ে যেতে না হয়। তবু হঠাৎ যখন দুর্ঘটনা ঘটে, ঘোড়ায় মানুষে একাকার হয়ে কোন্ গভীরে হারিয়ে যায়। সুখের বিষয়, খচ্চর আর গাধারা বেশির ভাগ মাল বয়—মানুষ ওঠে ঘোড়ার পিঠে।

সবার লক্ষ্য কেদারনাথ। ঐখানে গেলে পুণ্যি হয়, সারা জীবনের সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়; এই বিশ্বাস নিয়েই মানুষ এগিয়ে চলে। এই বিশ্বাসেই পাণ্ডবরা একদিন এই পথ হেঁটেছিলেন। সুতরাং তুমিও যাও, এগিয়ে চল, ওপরে ওঠো—আরও ওপরে, সবার ওপরে। ঐখানে সবার সর্বোপরে ভগবান বিরাজ করেন। তাঁর দর্শন পেতে হলে তোমাকেও ওপরে উঠতে হবে। ওপরে, আরও ওপরে। এবং তার জন্য হিমালয়ের ডাক কানে শুনতে হবে।

এবার আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি—আর মোটে তিন কিমি পথ বাকি পড়ে আছে। হাঁটা-পথে দীপককুমারের ক্যাম্বিশের জুতো ছিঁড়ে গেছে, তপনের টুপি উড়ে গেছে, ঘোড়ার পিঠে বসে শান্তারাম লিঙ্গম রীতিমতো জীবন সংশয় বোধ করছে। কমজোরি লোক—হেঁটে যাবার সামর্থ্যও তো নেই! মন্দাকিনী এতক্ষণ আমাদের চোখে চোখেই ছিল; এবার খুব বড় দুই পর্বতের ভূমিতল ছুঁয়ে তার ধারা বইছে। উজানে পাহাড়-শীর্ষে বরফ জমে জমে সাদা হয়ে আছে। এবার মন্দাকিনীর জলের দিকে তাকিয়ে দেখুন —খুব বড় একটি সমতল পাথরের চাঁই জলধারার উপর দাঁড়িয়ে আছে ছাপড়া ঘরে টিনের চালের মতো—নদীর এপার ওপার জুড়ে। সুতরাং স্বভাবতই চালের নিচে জলপ্রবাহ চোখে পড়ছে না। চালের উপর বরফ ঘন হয়ে জমে আছে—আর তলাকার জলধারা চালের প্রান্ত থেকে তোড়ে বেরিয়ে এসে নদীর খাদে পড়ে এগিয়ে চলেছে। কি বিস্ময়—চালের উপর বরফ, আর নিচেই তরল জল—ইঞ্চিখানেক চাল-তলের জল, কেন জমে বরফ হয়ে যায়নি, আমাদের মাথায় খেলছে না। মন্দাকিনীর উৎস আরও মাইল কয়েক উপরে, কেদার পাহাড়ে। প্রকৃতির এই রহস্যলীলা যখন গভীর মনোযোগে দেখ-ছিলাম, তখন কানে এলো একটি মেয়েলী কণ্ঠ—জোরসে চল মহারাজ!

ভদ্রমহিলা কাণ্ডির উপর আরাম করে বসে আছেন—চারজন বাহক সেই কাণ্ডি কাঁধে বয়ে চলেছে; উপর থেকে খবরদারি করে

তিনি জোরে চলার তাগিদ দিচ্ছেন ভারবাহক কুলীকে মহারাজ সম্বোধন করে। এই অঞ্চলে সবাই যে মহারাজ—কুলী, দোকানদার, পাকের ঠাকুর, বাস ড্রাইভার, মিস্ত্রী, মজুর, ম্যাজিস্ট্রেট—সবাই!

আমরা এবার কেদারনাথে পৌঁছে গিয়েছি। মাথার উপর মধ্য-দিনের সূর্য জ্বল জ্বল করছে, কেদার-বাসুকি-ভৈরবী পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে দুধের মতো সাদা হয়ে আছে—কেদার পাহাড়ের পাশে একখণ্ড স্বচ্ছ হিমানী ছত্রাকারে হাল্কা হাওয়ায় ভাসছে। চলন্ত জাহাজের দুপাশে সমুদ্রজলের লক্ষ লক্ষ কণা ভেঙে গুঁড়িয়ে যে ফুধাল আবর্তে বীজ বীজ করে, তারই একটি আবরণ যেন পাতলা চাদরের মতো পাহাড়ের আকাশে মেঘের মতো আশ্লিষ্ট হয়ে আছে—অথচ এ ঠিক মেঘ নয়; এ যেন বড় কড়ায় ঝলক-ওঠা দানা-ভাঙা দুধ। এ বস্তু আগে কখনও দেখিনি।

চৌদ্দ কিমির চড়াই-উৎরাই হাঁটা-পথ বাদে বাকি রাস্তা বাসে বসে আজ কেদারে আসা যায়। ভগবান শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বারো শ পঁয়ষট্টি বছর আগে। তখন হরিদ্বার-ঋষিকেশ থেকে শুরু করে সাড়াটা পথই ছিল দুর্গম। পাণ্ডবরা শক্তিশালী পুরুষ, গায়ে তাদের তাকৎ ছিল। কিন্তু সঙ্গে ছিলেন মেয়েছেলে, পাঁচ ভাইয়ের ভাগের বৌ দ্রৌপদী। কৃষ্ণ-কৃপাধন্য বলে কষ্ট এবং ক্লান্তি তাদের কিছু কমবোধ হয়েছিল কিনা কে জানে—তবে মনে হয়, এই সামান্য ব্যাপারে কৃষ্ণের করুণা তাঁরা প্রার্থনা করে বসেননি। মনে হয় শঙ্করাচার্যও কোন অলৌকিক কায়দায়, যোগবলে সূক্ষ্মদেহে কিংবা হালকা শরীরে কেদারে আসেননি, এসেছিলেন স্রেফ পায়ে হেঁটে। স্বয়ং ভগবান নররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেও তাঁর দেহ অন্য সব সাধারণ দেহের মতোই রোগ-ক্লান্তি-জরার অধীন। শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর পায়ে সেপ্টিক এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের গলায় ক্যানসার হলে ইচ্ছাশক্তিতে ব্যথা দমিয়ে না দিয়ে সাধারণ মানুষের মতই তাঁরা সব সহ্য করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের পর নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং রাজত্ব পেয়েও পাণ্ডবদের

মনে অশান্তির অন্ত ছিল না—আত্মীয়-নিধনের পাপবোধ বিবেকে কাঁটার মতো বিঁধছিল; যুদ্ধের বিভীষিকা সব সময় তাঁদের চোখের সামনে ভাসছিল। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কেদারনাথে গিয়ে ভগবান শিবের আরাধনা কর, শিব সন্তুষ্ট হলে মনের শান্তি ফিরে পাবে।

কিন্তু হিমালয়ে গিয়ে শিবের সাধনা কেন করতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তো স্বয়ং ভগবান—দুর্দিনে পাণ্ডবদের সঙ্গে-সাথে ফিরেছেন, কুরুক্ষেত্র জিতিয়ে দিয়েছেন—তিনি তো নিজেই পাণ্ডবদের মনে শান্তি এনে দিতে পারতেন; তবু কেন তাদের হিমালয় যাত্রার নির্দেশ দিলেন? দেখছি এর জবাবও ভন মুলারের জানা আছে, অন্তত এর জবাব খুঁজে বের করার মতো জ্ঞান ভন মুল্যার অর্জন করে ফেলেছে। 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র যতটুকু বুঝেছি,' ভন মুলার জানায়—'তাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের মনের কথাটি ছিল এই রকম: মনে শান্তি ফিরে পেতে চাও, বেশ কথা। কিন্তু তার জন্য তপস্যা চাই, দুস্তর ক্লেশ অতিক্রমের অগ্নিপরীক্ষা চাই—বিনা আয়াসে তা তো মিলবার নয়।' এবং এই বিশ্বাস মনে ধারণ করে ভন মুলার নিজেও কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছে। ইউরোপীয় খাওয়া-থাকা-চিন্তাধারায় আজীবন অভ্যস্ত ভন মুলার নইলে কি আর আমাদের ধরমশালায় নোংরা মেঝেয় শুয়ে অন্যের ব্যবহারী লেপতোষক গায়ে লেপ্টে পড়ে থাকতে পারত। নাকি ডালরুটি খেয়ে তার দিন কাটত! এবং আজ সে চড়াই-উৎরাই চৌদ্দ মাইলের বন্ধুর পথ কষ্টের পায়ে হেঁটেছে, তার মূলেও তো সেই বিশ্বাসই রয়েছে—কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলবে। তীর্থ হবে। মনে শান্তি পাবে।

একটি কথা ভাবতে ভাল লাগে—ভারতের ধ্যান-জ্ঞান, বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত নিয়ে পাশ্চাত্য লোকদের কারও কারও একটু ধারণা ছিল মাত্র। মোক্ষ মুলার রোমা রোঁলার মত পণ্ডিতরা মনে বিশেষ শ্রদ্ধাও পোষণ করতেন, কিন্তু সর্বসাধারণ লোক ভারতকে বর্বরের দেশ ছাড়া কিছুই ভাবত না। আজ যুগান্তরের ব্যবধানে

তাদের অনেকের মনে ভারত-আত্মার বাণী, তার অধ্যাত্ম সাধনার ইতিকথা ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছে। তীর্থের মন নিয়ে অনেকেই এখন ভারত দেখছেন। ভারতীয় গুরুর পায়ের কাছে বসে দীক্ষা নিয়ে গেরুয়া পরে পথে পথে কৃষ্ণনাম করছেন।

কেদারনাথে পৌঁছে মনে হল, বাঃ, চতুর্দিকের পাহাড় মাঝে বেশ তো বড় একটি সমতলভূমি। অদূরে বাসুকি পাহাড় থেকে দুধগঙ্গা মধুগঙ্গার ধারা বইছে—ডাইনে ধূমজ্যোতি সলিলমারুত-সংশ্লিষ্ট কেদার পাহাড়। সেইখানে মন্দাকিনীর মর্ত্য যাত্রা শুরু হয়েছে। মাইল তিনেক আগেই মন্দিরচূড়া দেখা গিয়েছিল—এবং পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরফ, অলৌকিক মেঘমালা, দুধগঙ্গা, মধুগঙ্গা নদী এবং কেদারনাথজীর মন্দির দেখে যাত্রীরা চীৎকার করে বলছে—জয় কেদারনাথজী! কেদারনাথের জয়ধ্বনি প্রথম শোনা গিয়েছিল কেদারের পথে, সেই রওনা হবার মুখে। তারপর পথ যতো দুর্গম বোধ হয়েছে, যাত্রীরা ততো বেশি ধ্বনি দিয়েছে—যেন ভাবখানা এই, তোমাকে দর্শন করতে যাচ্ছি; এবার বাঁচিয়ে-বর্তিয়ে নিয়ে পৌঁছে দেবার দায় তো তোমার! তিন মাইল আগে মন্দিরচূড়া দেখে সবাই বোধহয় ভেবেছিল—এবার তা হলে বেঁচেই গেলাম! মন্দিরে পৌঁছে কেদারের জয়ধ্বনিতে এবার তারা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। পথক্লেশের সমাপ্তিতে। ভক্তিতে। কৃতজ্ঞতায়। এখানে এসে কোন লোকের মনে ভক্তি আসে না, বোধহয় এমন কোন পাষণ্ড নেই। তবে কারও কারও মুখে ধ্বনি ফোটে না, কেউ কেউ বা ধ্বনি দিতে ইচ্ছা করেই ভুলে যায়। বাইরের আবেগের চাইতে বোধহয় অন্তরের আবেগ তাদের বেশি। শোনা যায়, শরৎচন্দ্র কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে যেতেন, কিন্তু ঘাড় নামাতেন না। অথচ শিবশক্তিতে বিশ্বাস এবং ভক্তিতে তাঁর ঘাটতি ছিল না।

ভোলা মহেশ্বর নাকি ছ'মাস বাস করেন উখিতে, ছ'মাস কেদারে। ছদ্মবেশে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবদের এই কথা বলে দিয়েছিলেন। ত্রিযুগী নারায়ণের অনেক আগে আমরা উখি ছেড়ে

এসেছি। এবার পাণ্ডবদের দিকে চোখ ফেরানো যাক। পাণ্ডবরা কেদারে পৌঁছে দেখতে পেলেন বটে বেশ কিছু মহিষ চরে খাচ্ছে—কিন্তু কোন্‌টি তার ছদ্মবেশী শিব? চিনে নেবার কোন উপায় বাৎলে না দিয়ে চক্রধারী নারায়ণ পাণ্ডবদের এবার মস্ত এক চক্করে ফেলেছেন—পরম আজ্ঞা-চক্রের অর্থভেদ পাণ্ডবদেরই করতে হবে। ভীমের মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল; এক পা বাসুকি পাহাড়ে, আরেক পা ভৈরবী পাহাড়ে রেখে চতুর্থ ভ্রাতাকে বললেন—'নকু শোন্, মোষগুলোকে তাড়া করে আমার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে নিয়ে যা দিকিনি।

নকুলকে ভীমদার আদেশ পালনে ব্যস্ত হতে দেখে বাকি চার পাণ্ডবও মোষগুলোকে তাড়া করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন—বুর্‌র্ হৈ! এমনকি দ্রৌপদীও কাকনপরা হাত নেড়ে মোষগুলোকে তাড়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত সবগুলো মোষই ভীমের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গেল, শুধু একটি বাদে—তার মতলব বড় সুবিধের নয়। পাণ্ডবরা তখন ভাবলেন, ওটাই মহিষরূপী মহেশ্বর। দেবাদিদেব মহাদেব—মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে তাই আপত্তি। ধর্ ওটাকে, ধর্ বলে পাণ্ডবরা এগিয়ে যেতেই মহেশ্বর ছুটে পালিয়ে পাতাল প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন—পাণ্ডবরা তখন তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে; পাতাল প্রবেশে বাধা পেয়ে তার পিঠের পেছন দিকটা তাই মাটির উপর পাথর হয়ে জেগে আছে। পাগল হয়ে মন্দিরে ঢুকে আমরা তাই দেখলাম, বছরে তিন লাখ তীর্থযাত্রীও ভক্তির চোখ দিয়ে তাই দ্যাখে।

অনেকে হয়তো ভাবে, শিবের পিঠ কোথায়, ও তো একটি পাথরের চাঁই! কিন্তু ঐ যে, যার যেমন বিশ্বাস। 'প্রচলিত কিংবদন্তী যাই হোক,' ম্লেচ্ছ ভন মুলার পর্যন্ত বলল—'এ কথা তো ঠিকই মনে হয়, কেদার জুড়ে ভগবান ভোলা মহেশ্বর বাস করছেন। একটা প্রতীক দিয়ে তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। এবার তোমরা

ফুলচন্দন দাও, পুজা কর, গড় হয়ে প্রণাম কর, কিংবা তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে ধ্যান করে তাঁর দর্শন লাভ কর।'

আজকের বাসুকি এবং ভৈরবী পাহাড়ে চোখ রেখে কেউ কেউ তর্ক তোলে—এমন দুই পাহাড়ে দুই পা রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়ানো কি সম্ভব? সাধারণ মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু ভীম তো ছিলেন অসাধারণ। কৃষ্ণকৃপাধন্য পাণ্ডবদের অন্যতম। আরও ভাববার আছে—তখন হয়তো পাহাড় দুটোব অবস্থান এমন ছিল, যে তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল কম—ভীম তাই দুয়ের মাঝে পা ফাঁক করে অক্লেশে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

আসল কথা হচ্ছে বিশ্বাস—ইচ্ছা হয় তুমি বিশ্বান কর, না হয় তর্ক করে মর। এই ভারতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছেন, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছেন, এই ভারতের মাটিব উপর দেহ বেখেছেন। মূঢ় পাষণ্ড ছাড়া ভারতবাসীরা তাই বিশ্বাস করে। সেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের কেদারতীর্থে পাঠিয়েছেন সাধনার দ্বাবা শিবকে সন্তুষ্ট করতে। সেই কথা কোটি কোটি ভাবতবাসী বিগত পাঁচ হাজার বছর যাবত বিশ্বাস করে আসছেন। তাই দুরূহ দুর্গম কেদারতীর্থে মানুষের নিত্যযাত্রা। তীর্থযাত্রা।

জগৎগুরু শঙ্করাচার্য নিজে ছিলেন শিবের অবতার। পৃথিবীতে তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বদবীনাথ থেকে পায়ে হেঁটে তিনি এলেন কেদারে, শিবেব দেহে লীন হয়ে যেতে। শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু স্বয়ং এসেছিলেন দ্বারকা থেকে প্রভাসে, জরা ব্যাধের হাত থেকে মৃত্যুবাণ গ্রহণ করতে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে ভগবান শিবের ডাক বত্রিশ বছর বয়সী শঙ্করাচার্য শুনতে পেয়েছিলেন; উনচল্লিশ বছর বয়সে পৃথিবীতে করণীয় সব কাজ শেষ করলে বিবেকানন্দর কানে এসেও পৌঁছেছিল রামকৃষ্ণের ডাক—'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক গে, সংসারের ভাল-মন্দ সংসারীরা দেখুক গে—তুই ওসব ছুঁড়ে ফেলে আমার পিছু পিছু চলে আয়।' বিবেকানন্দ ঠিক চলে গেলেন।

বদরীনাথ থেকে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন কেদারে—এইখানে সবার অগোচার অপ্রকট হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মরদেহের হদিস কখনও মেলেনি। তবু মন্দাকিনী তীরে তাঁর সমাধি-মন্দির তৈরী হয়েছে—কংক্রিটে গেঁথে তৈরী করা হয়েছে তাঁর দণ্ড, যে দণ্ড হাতে সন্ন্যাসীর বেশে হেঁটে গিয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের চার প্রান্তে তিনি চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন—পুবে পুরী, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পশ্চিমে দ্বারকা, উত্তরে যোশীমঠ (বদরীনাথ)। ভাবতে অবাক লাগে, ইংরেজ চিরকাল প্রচার করেছে, ভারত কখনও এক ছিল না—পণ্ডিতম্মন্য কোন কোন ভারতীয় নাকি সে কথা বিশ্বাসও করে! প্রায় তেরো শ বছর আগে যে এক সুবৃহৎ ভারতবর্ষের ধ্যান শঙ্করাচার্যের মনে বিরাজিত ছিল, তারই তো বড় প্রমাণ চার প্রান্তে চারটি মঠের প্রতিষ্ঠা—পাঁচ এবং আট দশ হাজার বছর আগের সাহিত্যে, পুরাণে অজস্র প্রমাণ তো রয়েইছে।

শঙ্করাচার্যের সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাছেই ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি সৌধ নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অবসরপ্রাপ্ত এক বঙ্গীয় এঞ্জিনীয়ার তদারকি করছেন। 'এতদিন এখানে আমাদের কোন ঘর ছিল না,' ভদ্রলোক বললেন—'চড়া দক্ষিণায় ঘর ভাড়া নিয়ে তীর্থযাত্রী রেখেছি। এবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের নতুন বাড়িতে অনেক লোকের ঠাঁই হবে।'

বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম, খবরটি দিতে পেরে ভদ্রলোকের বেশ আনন্দ হচ্ছিল। এই আমাদের সনাতন ভারতবর্ষ, এই হচ্ছে আমাদের সেবা-পরায়ণ ভারত সেবাশ্রম সংঘ। কাশ্মীর,-পাঞ্জাব-কন্যাকুমারী, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ থেকে আপনি দূর-দুর্গম হিমালয়ে তীর্থ করতে যাবেন—সুখ-দুঃখে বিগতস্পৃহ সন্ন্যাসীরা আপনাদের সেবা করবেন—থাকা-খাওয়া-ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করবেন। সারা বিশ্বে কি আর এমন কোথাও আছে!

এবার আমরা এগিয়ে চলেছি বদরীধামের দিকে। গৌরীকুণ্ড

থেকে ভোর পাঁচটায় বাস ছেড়েছিল। এবং এজন্য কাল সন্ধ্যায় আমরা টিকেট কিনে রেখেছিলাম। এখন মরসুমের সবে শুরু—যাত্রীর ভিড় তেমন নেই; যাত্রীর সংখ্যা কম হলে বাস মোটেই ছাড়ে না। ফলে বাস ছাড়ার দিনে ভিড়ের কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভোর চারটেতেই বাস স্টেশনে লোক লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিল—তখন গোল বেঁধেছে দুজন বেহারীকে নিয়ে; পরে এসেও লাইনের তোয়াক্কা না করে তারা গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করছে। দেখতে ষণ্ডা-মার্কা, গায়ে জোর আছে বলে অন্যের আপত্তি তাদের গ্রাহ্য হচ্ছে না—গায়ের জোরে আগে উঠে তারা পছন্দ মত সিট লজ্জার মাথা খেয়ে দখল করে বসেছে। যাত্রীদলে একজন বিদেশী আছেন বলে ব্যাপারটি বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকছে।

বেশ লম্বা বলিষ্ঠ গঠন এক ফরাসী যুবক পিরানিজের উত্তর-পূর্বে স্পেন-ফ্রান্সের সীমা থেকে যাত্রা শুরু করে একরকম পায়ে হেঁটেই ইটালী, ইয়োগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্থান, পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে ঢুকেছেন—আফগানিস্থানে এগিয়ে চলেছিলেন ধীর পদযাত্রায়, হিউয়েনসাঙের ভারতমুখী তীর্থপথ অনুসরণ করে। অন্য অনেক ইউরোপীয়ের মতো ফরাসী যুবক একজন ভারতীয় গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তবে সম্প্রতি কিছু দোটানায় পড়ে গিয়েছেন। প্যারিসে স্বামী চিন্ময়ানন্দ নামে এক প্রচণ্ড পণ্ডিত বাঙ্গালি গুরুর সান্নিধ্য তার খুবই ভাল লেগেছে; ভারতীয় সভ্যতা, অতীত ঐতিহ্য, বেদবেদান্ত সম্বন্ধে চিন্ময়ানন্দর বক্তৃতা বড়ই তার ভাল লেগেছে। ওদিকে প্যারিসের রাস্তায় ইস্কনের মুণ্ডিতশীর্ষ কৃষ্ণসন্ন্যাসীরা তাকে আরেক বাঙ্গালি অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রণীত 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' পড়তে দিয়েছিলেন। সেই গীতা পড়ে, তাদের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দেখে, প্রসাদ খেয়ে, কৃষ্ণনাম শুনে তার মনের টান অনেকটা ওদিকেও চলে গেছে। 'স্বামী চিন্ময়ানন্দর শিষ্যত্ব কিংবা ইস্কনে যোগদান, যে কোন একটা অবিলম্বে আমাকে বেছে নিতে হবে।' ফরাসী যুবক বললেন—'নষ্ট করার মতো সময় আর নেই।'

গৌরীকুণ্ড থেকে সর্বমোট ছু'শ কিলোমিটার পথ—সুখের বিষয়, বাস থেকে নেমে ডাণ্ডী, কাণ্ডিতে চেপে কিংবা পায়ে হেঁটে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আমাদের বদরীতে পৌঁছাতে হবে না—বাস থামবে গিয়ে একেবারে মন্দিরের কাছে, গোপেশ্বর চামৌলি যোশীমঠ পেছনে ফেলে।

বাস-চলা অনেকটা পথই বেশ ভাল এবং চওড়া, ছুদিকে অনেকটা করে প্রায়-সমভূমি। বনশ্রেণী ঘনই বলতে হবে, বাঁশের ঝাড় খুব বেশি, কিন্তু বাঁশ কোথায়—সবই প্রায় কঞ্চি-মতো। কিছু বন্য ধরনের বীচ্ গাছও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওক, বার্চ, সিডার গাছ একটিও নেই; কারণ হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে দীর্ঘকাল গ্রীষ্ম ঋতু ভর করে থাকে। শুধু ইউরোপ, আমেরিকা নয়, পাহাড়ী জাপানে চলুন—শীত বেশি বলে জাপানে শীতমুল্লুকের সব গাছই চোখে পড়ে। আমাদের ইচ্ছা-পূরণের জন্য ছুনিয়ায় অনেক কিছুই ঘটে না—নইলে কাশ্মীরের মতো আপেল হিমালয়ের সর্বত্রই ফলতে পারত কিন্তু কোথায় আপেল কেদারের হিমালয়ে কিংবা বদরীর বনভূমে!

গৌরীকুণ্ড ছাড়ার সময় যাত্রীরা সবাই জয় কেদারনাথজী, জয় বদরীনাথজী ধ্বনি দিয়েছিল; এখন আর কারও মুখে ধ্বনি দেবার ইঙ্গিত নেই, ভগবানের নাম নেই। ভক্তের ভগবান নিশ্চয় মনে মনে হাসছেন! শ্রীকৃষ্ণের মতো চালাক-চতুর হলে বদরীনাথজী এতক্ষণ বোধহয় গুরুতর কোন বিপাকের সঙ্কেত দিয়ে যাত্রীদের কাছে খানিক ভক্তি আদায় করে নিতেন!

আমি সীতাপতি পাণ্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সীতাপতি মসৌরির লোক, বয়স সাতান্ন, চেহারা আলু-ভাতে। বাংলা বা বাঙ্গালি সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। সঙ্গে রয়েছেন তার বৌ—তারও পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে এবং এরই মধ্যে মুখে-গালে-গলায় তার কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠেছে। ক্ষেতিবাড়ি, ছেলে-বউ নাতি-নাতনী নিয়ে সীতাপতি একজন ঘোর সংসারী লোক—তার মনে কোন তীর্থযাত্রার আবেগ নেই, বিবেক-বৈরাগ্য নেই। মন পড়ে আছে তার ঘরে—

গরু-মোষ-মুনিষ এবং চাষ-বাসে। বৈরাগ্য অবশ্য আমাদের মনেও খুব একটা নেই, কেদার-বদরীগামী আমাদের পূর্বপুরুষদেরও বোধ হয় তেমন ছিল না। তারা নাকি এই দুর্গম তীর্থে পা বাড়াবার আগে আপন আপন বিষয়-সম্পত্তি উইল করে আসতেন এবং জীবিত অবস্থায় ফিরে গেলে উইলের শর্ত অনুসারে সব সম্পত্তি ফিরিয়ে নিতেন, নিতে পেরে খুশি হতেন! সুতরাং সীতাপতিদের সমালোচনা করার প্রশ্নই আসে না। বরং এরই মধ্যে তিনি বাঙ্গালিদের সমালোচনা করার সুযোগ পেয়ে গেলেন—বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ মাছ ছাড়া ভাত খায় না শুনে নিষ্ঠাবান নিরামিষ-ভোজী ব্রাহ্মণ সন্তান সীতাপতি জানিয়ে দিলেন, পৃথিবীতে যে এতবড় বিস্ময় এখন আছে, সে কথা কখনও তার মনেই হয়নি।

আমি বললাম—আপনি তো চাষবাস করেন, কিন্তু তা তো বামুনের পেশা নয়। একথা শুনে সীতাপতি অবাক—জমি চাষ করা কেন যে ব্রাহ্মণের কাজ নয়, তা বুঝতেই পারেন না। সীতাপতি জন্মাবধি দেখে এসেছেন, আশপাশের সব বামুনই ক্ষেতি করে, মোটা-মুটি সবাই বড় মাপের চাষী, যাকে বলে ফার্মার।

পাণ্ডেরা চাল-ডাল-ঘি হাতা-খুন্তি-হাণ্ডি, থালা-গেলাস-বাটি সবই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, কারণ পরের হাতে পাকানো অন্নব্যঞ্জন প্রাণ গেলেও তারা মুখে তোলেন না। সঙ্গে আনা চীজের মধ্যে ঘি একটি অত্যন্ত আবশ্যিক বস্তু, কারণ পাণ্ডেরা নাকি নিশ্চিত খবর রাখেন, একমাত্র ঘরে তৈরী ঘি ছাড়া বাজারে খাঁটি ঘি বলতে কিছু নেই। সীতাপতির মতো সব চাষীলোকের বাড়িতে রান্না হয় খাঁটি ঘিয়ে—তেলের ব্যবহার তাদের জানাই নেই। পাঞ্জাব হরিয়ানায় অবস্থাও প্রায় একই রকম—গাঁয়ে ঘরে বলতে গেলে সবারই বিস্তর জমি-জমা আছে, মোটামুটি সবাই সম্পন্ন চাষী এবং সবার বাড়িতেই রান্না হয় খাঁটি ঘিয়ে। 'ঘর মে তেল কৈ খাতা নেহি সাব', সীতা-পতি বলেই ফেললেন—'খানা বানতি হ্যায় ঘিউ সে!' কথাটি অনেকক্ষণ আমার মনে রইল, অজ্ঞাতসারে ঘন ঘন আমি

আউড়াতে লাগলাম—ঘর মে তেল কৈ খাতা নেহি সাব, খানা বানতি হ্যায় ঘিউসে! আমরা খাঁটি ঘি খেয়ে এসেছি সেই পদ্মার হে-পারে; এখন তার স্বাদ গন্ধ ভুলেই গেছি। এখানে তো দেখছি ভেজাল, তেলও মাঝে মাঝে অমিল হয়!

বাসে বসে মাঝে মধ্যে সীতাপতি মুখে ফেলছিলেন চুরমা; আসলে তা হচ্ছে গমের ছাতু। অঢেল ঘি আব চিনি মিলিয়ে তৈরী করা। স্বপাকে খানা তৈরীর সুযোগ না ঘটলে চুরমা খেয়ে ওদের দিন চলে যায়; তা যতদিন খুশি ট্রেনে বাসে কেটে যাক না কেন। আমিও কিঞ্চিৎ চুরমা চেয়ে নিয়ে আপন গরজে চেঁখে দেখলাম। সত্যি চুরমা বড়ই সুস্বাদু—সুগন্ধ তার মনোলোভন। আমার মতামত শুনে চিরদিনেব সমালোচনাপ্রবণ সহযাত্রী এক বঙ্গসন্তান বললেন—'ঘিয়ে তৈরী জিনিস, স্বাদ কেন হবে না মশাই?—ঘিয়ে ঘাস ভেজে খেয়ে দেখুন না ক্যানে, অমর্ত্তর মত না লেগেই পারে না!'

আমি যখন ঘৃতপ্রলিপ্ত চুবমা, ঘৃতপক্ক অন্নব্যঞ্জনের কথা শুনে সীতাপতিদের সৌভাগ্যের তারিফ করছিলাম, সীতাপতি তখন একটুখানি মুচকি হাসলেন। পাহাড়ময় অঞ্চলে বসবাস করে পাহাড়ী জমি চষতে দেহের রক্ত যে জল হয়ে যায়, অনেক শ্রম-চিন্তা-অর্থ ব্যয় কবে ফসল ফলাতে হয়। অনেক কষ্টে গাই-মোষ পালন করে ঘি-দুধের মুখ দেখতে হয়। সেই সব কথা বোঝাতে গিয়ে সীতাপতি বললেন—পাহাড়-কা বাসা, কূল-কা নাশা অর্থাৎ পাহাড়ী এলাকায় বসবাস কবা সোজা নয়, একেবারে কূল-নাশিনী নদী তীরে বসবাসের মতই বিপজ্জনক।

'তোমাদের সমতলে জীবনযাত্রা কত সহজ', সীতাপতি পাণ্ডে বললেন—'আব আমাদের পদে পদে সংগ্রাম। জমিতে হাল দেবার কথাটাই ধর না ক্যানে', কষ্টের জীবনের আরও কিছু ব্যাখ্যা করতে সীতাপতি বললেন—। 'তোমরা গরু-লাঙল নিয়ে জমিতে যাও খুব সহজে হেঁটে, কাজের শেষে তেমনি হেঁটে বাড়িতে ফেরো। আর আমাদের? চড়াই-উৎরাই ভাঙো, গায়ের রক্ত জল কর!'

সাগরে সমুদ্রে যারা দিনের পর দিন জীবিকার প্রয়োজনে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়, তাদের অনেকেই কিন্তু মনে করে, এ লাইফ ওয়েস্টেড অর্থাৎ জীবনের শুধু অপচয় ছাড়া সমুদ্রে আর কিছুই নেই। কারণ সব রকম ভোগের ব্যবস্থা সেখানে নেই; সীমিত ভাণ্ডারের সঞ্চয় বসে বসে শেষ কর, আপন আপন কাজ কর, শুয়ে শুয়ে ঘুমাও—ব্যস। পাহাড়ের জীবনে আয়েস কম, তবে বৈচিত্র্য আছে—কেউই সেখানে ভাবে না, জীবনটা বৃথা যাচ্ছে। ভাববার সময় কোথায়!

অনেকটা পথ চলে এসেছি; গাঁ-গঞ্জের মতো এলাকা দেখা যাচ্ছে। ঝরণার ধারে বৌরা বাসন মাজতে বসেছে, হাতের চুড়ি তাদের রিণ রিণ করে বাজছে। বিচুলি-পেছানো একটা গাছের গোড়ায় একটি গাই-গরু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। বিচুলি-গুলো যে তার নাগালের বাইরে!

এই অঞ্চলেও গাছে গাছে সবে আমের মুকুল এসেছে। কারণ সেই একই—বিলম্বে শীত বিদায় হয়েছে বলে গাছের ফুল-ফোটানো ওম লেগেছে বাংলার অনেক পরে। একটি উপমা মনে আসছে—সর্বদক্ষিণ জাপানের কিউস্যুতে শীত আগে চলে যায় বলে চেরিফুল ফোটে মার্চ মাসে। উত্তরে মুরুরাণে চলে যান—এপ্রিলের শেষে সেখানে শীতের ঘুম ভাঙে, মে মাসের প্রথমে গাছে ওম লাগে—ফুল ফোটে আরও দেরিতে। অথচ একই দেশ!

অনেক আগে চামৌলি পেরিয়ে এসেছি। চামৌলিতে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার কণ্ডাক্টার বেপাত্তা; যাওয়ার আগে ওরা কাউকে জানিয়ে পর্যন্ত যায়নি, গাড়ি এখানে কতক্ষণ দাঁড়াবে, কখন ছাড়বে। হরেক রকম দরকার বোধ হলেও গাড়ি থেকে কেউ নামতে সাহস পাচ্ছে না—ড্রাইভার এসে যদি গাড়ি ছেড়ে দেয়! পরের গাড়ি যে কত পরে আসবে তার কি আর কিছু ঠিক আছে!

রাস্তা এবার খুবই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। ধাপে ধাপে অজস্র বাঁক

ঘুরে গাড়ি হাজার ফুট উপরে উঠছে, পরের ধাপে আবার হয়তো নেমে যাচ্ছে হাজার-দেড় হাজার ফুট। যাত্রীরা আবার বদরীনাথের জয়ধ্বনি শুরু করেছে। হায় রে মানুষের মনে চিন্তার বিচিত্র ধারা—তীর্থে এসেও প্রতি মুহূর্তে ভাবে ভগবান ছাড়া আর সব কিছু। তোমাকে সব সময় বসে বসে ভাবব এমন কোন কথা আছে? বিপদ দেখলেই তোমাকে ডাকব, ব্যস—আবার কি!

যোশীমঠ ঘণ্টা দেড়েক আগে ছেড়ে এসেছি। এটি ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চার মঠের অন্যতম। শঙ্করাচার্যের পবিত্র পদধূলি যোশীমঠে এখনও লেগে আছে। এবার এসেছি বদরিকায়। রাত সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোয় মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে—পাশ দিয়ে ব্যগ্রবেগে অলকানন্দা বয়ে চলেছেন। গাড়োয়াল মণ্ডলের নানা অঞ্চল থেকে গোটা তিরিশেক বাস এসে যাত্রী নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভরা মরসুমে রোজ পঞ্চাশ থেকে দেড়শখানা পর্যন্ত যাত্রীবাহী বাস বদরীধামে এসে থামে। যাত্রী নামায়!

আপাতত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত ইত্যাদি অস্বস্তিকর আপদগুলো আমাদের বিব্রত করার হুমকি দিচ্ছে। কোথায় উঠব ভাবছি—এমন সময় স্বাগত জানিয়ে যাঁরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁরা বালানন্দ আশ্রমের সন্ন্যাসী-কর্মী। ভাগ্য ভালই বলতে হবে—গৌরীকুণ্ড থেকে ব্রহ্মচারী দেবনারায়ণ বালানন্দ আশ্রমে আমাদের থাকার সুপারিশ করে চিঠি দিয়েছিলেন! সুতরাং আশ্রম খুঁজে বেড়াবার শ্রম আর সময় ব্যয় করতে হল না। অবিলম্বে আশ্রমের আরামকর ঘরে গিয়ে ভারি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হল।

যে জিনিস সর্বাগ্রে আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল তা আর কিছুই নয়—প্রতি ঘরসংলগ্ন বাথরুম!

তীর্থ-হিমালয়ে রাজসিক ব্যবস্থাই বটে!

· কেদারের মতই বদরীর অবস্থান, চারদিকে পাহাড়-প্রকৃতিও প্রায় একই রকম—কেদারে মন্দাকিনীর মতো বদরী পাহাড়েও

তেমনি অলকানন্দার উৎস, মধ্যখণ্ড জুড়ে তেমনি উদার আনতভূমি। কেদার আর বদরীর সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড জুড়ে তীর্থকেন্দ্র গড়ে উঠবে বলেই ভগবান ছুটি ক্ষেত্রের মাঠঘাট এমন প্রশস্ত করে তৈরী করে-ছিলেন কিনা, কিংবা এমন করেছিলেন বলেই এত ভারি ভারি তীর্থ-ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল, তার খবর একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ রাখেন বলে মনে হয় না।

বদরী দেবভূমি, চারিদিকে তার স্বর্গরাজ্য। নন্দনকানন বদরী থেকে দূরে নয়, কুবের নিকেতন ছিল ঐ তো কুবের পাহাড়ের ওধারে, তপোবনের ধারে কাছে। অদূরে শতপথ ; ওখান থেকেই পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বর্গরাজ্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো বদরী থেকে কুড়ি মাইলের বেশিদূর প্রায় কোনটাই নয়। স্বর্গ বললে মর্ত্যের মানবরা সবাই উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, কেউ মারা গেলে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, স্বর্গে গেছেন। স্বর্গ উপরে, সবার উপরে, পাপ-পঙ্কিল ধরণীর ধূলি থেকে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে। মৃত্যুর পর সবারই স্বর্গ হচ্ছে বাঞ্ছিত ভূমি—মর্ত্যজীবনে পুণ্যের সঞ্চয় না থাকলে মরণের পরে স্বর্গে যাবার পাসপোর্ট কারও মেলে না।

পাণ্ডবদের তখন বয়স হয়েছে—সংসার-সুখ, রাজ্যভোগ, যুদ্ধ-হত্যা-রাজনীতি ইত্যাদি স্তরগুলি অতিক্রান্ত। পরপারের ডাক এসে গিয়েছে। সশরীরে তাঁরা হিমালয়ের ক্লেশ-ক্লান্ত পথে তাই এগিয়ে চলেছেন। মরণ বিছানো স্বর্গের পথে—সখা-সঙ্গী-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়। এবং নির্দেশে। পাণ্ডবরা যে তাঁর বড় ভক্ত—ভক্ত অর্জুনকে তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যুধিষ্ঠিরকে পরম-পুণ্যাত্মা ধর্মরাজ বলে মান্য করেছিলেন। স্বর্গের পথে তিনি যে তাঁদের এগিয়ে দেবেন সে তো খুবই স্বাভাবিক !

একদিন মন্দাকিনী, অলকানন্দা, নন্দনকানন, অলকাপুরী, তপোবন ইত্যাদি স্বর্গলোক সম্পর্কিত নামগুলো শুনে শুনে কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। মনের ঘোড়া মুহূর্তে ছুটে চলত সে-

কোন-সুদূর শূন্যলোকে—আবেগপ্রবণ মন কেবলই কল্পনা করতে চেষ্টা করত, হিমগিরিশিখরের কোন্ স্বর্গপ্রান্তে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর ধারা বয়ে যায়, নন্দনকাননে ফুল ফোটে, অলকাপুরীতে কুবের-নিকেতনের কাছে উজ্জয়িনীর শিপ্রা, বেত্রবতী পার-হয়ে-আসা মেঘ-গুলির যাত্রাবসান ঘটে। আজ তাদের কত কাছে এসে পড়েছি। কি বিস্ময়, সে কি বিস্ময়!

মনে শুধু একটি আপশোষ ছিল—এই অঞ্চলগুলো যদি এমনি পাহাড়ী না হত, এমন এবড়ো-থেবড়ো আর দুর্গম না হয়ে বাংলার মতো সমভূমি হত এবং তারই উপর হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকত, তা হলে সৌন্দর্য নিশ্চয় আরও খোলতাই হত! কিন্তু তাহলে যে এই হিমালয় জুড়ে হিংসা-দ্বেষ-পাপের আবর্ত-উদ্বেল সব জনপদ গড়ে উঠত। লোক গিজ গিজ করত; প্রাসঙ্গিক যতো পাপ এসে হাজির হত। তাই বোধহয় পাহাড়ের ঐশ্বর্যে ভরিয়ে রসিক ভগবান এই অঞ্চলগুলো বরফে ঢেকে রাখেন। বরফ গলে গেলে এখানে কষ্ট করে এসে পড়, তীর্থ কর; স্বর্গের আভাস আর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে যাও—কিংবা এখানেই দেহ রক্ষা কর!

কেদার-বদরীতে গিয়ে বৃন্দাবনের কথা আমার মনে পড়ত—কোথায় তার রোম্যাণ্টিক বনস্থলী, কোথায় কদম্ববন, পিয়াল-তরুর কুঞ্জতল—সারা বৃন্দাবন জুড়েই তো রাক্ষসভূমির দূর-বিস্তার, গাছ-পালায় অনুদার অলক্ষ্মী রূপ, জমিগুলো পর্যন্ত উঁচু-নীচু আর অসমান। বৃন্দাবনের যমুনাতীরবর্ণচারী কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থল নাকি ধরা পড়ে শুধু ভক্তের চোখে। এবং আজও। অর্থাৎ তার জন্য গভীর সাধনা কর, দেখে নাও। না করে কে!

বদরীতে অনেক লোকই তীর্থ করতে আসে। বছরে তিন থেকে চার লাখ। কিছু ইউরোপ আমেরিকার লোকও অবশ্য আসে—কেউ কেউ তামাসা দেখতে, অনেকে আবার তীর্থের মন নিয়ে। শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বেশির ভাগই পুরুষের সঙ্গে যুগলে ফেরে। যারা একাকিনী আসে, তাদের কেউ কেউ

বদ-মতলবে ঘোরে, পাঁচ-সাত-দশ অশ্বশক্তিসম্পন্ন জোয়ান পুরুষ খোঁজে। পদস্খলিত ব্রহ্মচারীরা সন্ন্যাসাশ্রম ছেড়ে এসে তাদের সেবায় লাগে!

বদরীতে বিচিত্র একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি এসেছেন তার সদ্য-প্রয়াত পিতার বিদেহী আত্মার উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে! বদরী মন্দির থেকে সামান্য দূরে অলকানন্দা-তীরবর্তী ব্রহ্ম-কপালে তখন তিনি বসে আছেন। শ্রাদ্ধবেদীতে। তার মাথা কামানো, কপালে তিলক, পরণে গরদের ধুতি। মধ্যবয়সী পুরুত ঠাকুরের উচ্চারণ শুনে বাঙ্গালিই মনে হচ্ছে। এগিয়ে যেতে কানে এলো মন্ত্রের ক'টি অংশ—এতে গন্ধপুষ্পে, এতৌ ধূপদীপৌ, ব্রাহ্মণায় অহম্—একটু থেমে পুরুত বললেন দদামি। সাহেব উচ্চারণ করলেন—ডডামি! ভদ্রলোকের নাম হেনরি ফক্স, তার পরলোক-গত পিতাঠাকুরের নাম এলবার্ট ফক্স। সংস্কৃত ষষ্ঠী বিভক্তি করণের সুবিধার্থে 'এলবার্ট ফক্সস্যকে' বুদ্ধিমান পুরোহিত দিব্যি 'এলবার্ট ফক্স দাসস্য' করে নিয়েছেন!

পিণ্ডদান ক্ষেত্রের নাম ব্রহ্মকপাল হবার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। শিব একদিন বেদম রেগে গিয়ে ব্রহ্মার পাঁচমুণ্ডের একটি কেটে ফেললেন। কিন্তু কি বিপদ—মাটিতে না পড়ে মুণ্ডটি শিবের হাতে ঝুলে রইল। শিবঠাকুরের অবস্থা এখন বড়ই করুণ; পাগল-পাগল হয়ে তিনি ঘুরে ফিরছেন। শেষ পর্যন্ত অলকানন্দা-তীরবর্তী এই স্থানে এসে তাঁর হাত থেকে মুণ্ডটি ঝপ করে পড়ে গেল। তখন থেকে এই স্থানের নাম হল ব্রহ্মকপাল। এখানে বসে পিণ্ডদান করলে আত্মার নাকি সদ্গতি হয়—এটি হচ্ছে হিন্দু বিশ্বাস!

কিন্তু প্রাগুক্ত ইংরেজ হিন্দু নয়; তার এই বিশ্বাসের হেতু কি? আলাপ শুরু করতেই আমি বললাম—'মশায়ের বর্তমান নিবাস?'

বেশ বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন—'শ্রীধাম কাশীতে।'

'কতদিন সেখানে আছেন?'

'তা অনেকদিন। দশ বছরই বলতে পারেন।'

'কি করা হয়?'

'বেদ-বেদান্ত পাঠ করি।'

'আপনি খেরেস্তান না?'

'আজ্ঞে আগে ছিলাম। এখন গীতা-ভাগবত, বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি পড়ে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে, হিন্দুধর্মের চেয়ে পৃথিবীতে বড় কিছু নেই। এবং বড় কিছু হতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম-দর্শিত মত এবং পথই আসল পথ। আত্মার যে মৃত্যু হয় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরার মতো আত্মা যে পুনর্জন্ম নেয়, এখন তা বিশ্বাস করি।'

'সেই জন্যই কি—'

'আজ্ঞে তাই। পিতৃদেব সম্প্রতি দেহ রেখেছেন। তাঁর আত্মার যাতে সদ্গতি হয় তাই আমার কাম্য। তারই জন্য পিণ্ডদান!'

আমি যে আমি, না কোন ধর্মের ধার ধারি, না কোন ধর্ম-চর্চা করি, দেশে দেশে ফিরি, সেই আমিও ইংরেজের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার পরলোকগতা মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর মৃত্যুসময়ে আমি ছিলাম আটলান্টিকের ওপারে। দেহত্যাগের সাত দিন আগে এবং দুদিন পরে মা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে অনেক বাস্তব কথা বলেছিলেন। কিন্তু ছ'মাস পর আমি দেশে ফিরে এলে মা দেখা দিয়েছিলেন সশরীরে। আষাঢ়ের সন্ধ্যাবেলা—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ঘেরা বারান্দায় আমি হাঁটছি—মা দিব্যি আমার পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন! ব্যাপারটি ঠিকমতো ঠাহর হতেই আমি চেঁচিয়ে উঠি—মা-মা! সঙ্গে সঙ্গে মা অদৃশ্য হলেন!

যে আত্মার মৃত্যু নেই, আবার তা জন্ম নিতে পারে মানছি। কিন্তু কোন্ অলৌকিক উপায়ে নিছক পুত্র-স্নেহের তাগিদে তা আবার ক্ষণকের জন্য দেহ ধারণ করতে পারে, তার বিজ্ঞানসম্মত কোন ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাইনি—অবিকল সেই দেহ, যা গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, মা কত

সহজে হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে আত্মার মৃত্যু নেই! বদরীতে আজ আবার নতুন করে মনে পড়ল।

শ্রাদ্ধবাসরে উপবিষ্ট মুণ্ডিতশীর্ষ হেনরি ফক্সকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেন তপশ্চারণের দীপ্তিতেই মুখটি তার ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নিয়ে আমরা শ্রাদ্ধ করতে বসি। হেনরি ফক্সের সে সংস্কার নেই। এই দেবভূমিতে দশ বছর বাস করে, শাস্ত্রাদি পাঠ করে তার উপর হিন্দুত্ব স্বয়ম্ আরোপিত হয়েছে, হিন্দুর বিশ্বাস এবং যুক্তি মূর্তি ধরেছে। মুখেও তার সেই ছাপ পড়েছে। গেরুয়াপরা কৃষ্ণনাম করা মুণ্ডিতশীর্ষ ইস্কনের পাশ্চাত্য সন্ন্যাসীদের দেখুন, কিংবা শাখা-সিন্দুর-শাড়ি পরা নোলক-নাকে শ্বেতাঙ্গিনী ইস্কনীদের দিকে তাকান—শ্রীকৃষ্ণ তাদের যে কতটা ভারতীয় করে তুলেছেন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এবার বদরীর আসল কথায় ফেরা যাক। এইখানে বিশাল নামে এক দৈত্য বাস করত। তাকে দমন করতে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে চলে এলেন বিষ্ণু—এসে প্রথমে ধ্যানস্থ হলেন। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী তখন একা। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীও চলে এলেন বদরীতে, বেরি গাছের রূপ ধরে ধ্যানী বিষ্ণুর মাথায় ছায়া দিতে। বেরির অপর নাম বদরী (বাঙ্গাল দেশে বোরোই, ঘটির দেশে টোপাকুল)—আর এই জায়গার নাম হল বদরিকা আশ্রম, আর বিশাল দৈত্যকে দমন করার জন্য বিষ্ণুর নাম হল বদরীবিশাল। বদরীনারায়ণ নামেও ভক্তরা তাঁকে অভিহিত করে।

বিষ্ণুর পর নরনারায়ণ নামে এক অবতার পুরুষ এসে নর ও নারায়ণ পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিছু দিন বাস করেছিলেন। নর ও নারায়ণের অন্য অবতার অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ।

এইখানেই মুনিগণের ধ্যান-নাশিনী উর্বশীর জন্ম। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ বদরীতে গভীর ধ্যানমগ্ন হলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পদস্খলনের জন্য একজন অপ্সরা পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কোন সুবিধা করতে না পেরে রূপসী অপ্সরাকে বিদায় নিতে হল। নারায়ণ তখন একটি চমকপ্রদ কাজ করলেন—আপন উরুদেশ থেকে এক পরমা সুন্দরী

অপ্সরা সৃষ্টি করলেন। উরুতে সৃষ্টি বলে নাম হল তার উর্বশী। নিজে না রেখে ভগবান নারায়ণ উর্বশীকে পাঠিয়ে দিলেন বিষ্ণুর কাছে। উপহার স্বরূপ!

সপ্তম শতাব্দীর কথা। বৌদ্ধরা তখন তিব্বত থেকে বদরী অঞ্চলে যাতায়াত করত, বদরীর লোকও পাহাড় ডিঙিয়ে তিব্বতের দিকে গিয়ে ভেড়া চড়িয়ে আসত। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই অবস্থাই চলছিল। চীনের ভারত-আক্রমণের পর সব কিছু গেল বন্ধ হয়ে। এখন বদরীনাথ মন্দির থেকে মাত্র তিন কিমি দূরে মানা গ্রামে ছাউনি ফেলে আমাদের জোয়ানরা রাতদিন সীমান্তের দিকে নজর রাখছেন। মানা থেকে চীন সীমান্ত মোটে তিন মাইল।

সে যুগের বৌদ্ধরা কিন্তু বদরী মন্দিরের নারায়ণ মূর্তিকে ভগবান বুদ্ধজ্ঞানে পূজো করত, কারণ বুদ্ধের মতো নারায়ণও এখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। সপ্তম শতাব্দীর দুঃসময়ে বৌদ্ধধর্মের অনাচার সারা ভারতে প্রকট হয়ে পড়েছে—শিবাবতার শঙ্করাচার্য তখন হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য পদব্রজে ভারতময় ঘুরছেন। বৌদ্ধরা সে খবর রাখতেন। বদরীধামে শঙ্করাচার্যের আসন্ন শুভাগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বৌদ্ধরা বিচলিত হলেন, বদরিকা আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন আপন দেশে। কিন্তু যাওয়ার আগে তারা একটি মহৎ কর্ম করলেন—নারায়ণের মূর্তি মন্দির থেকে তুলে এনে অলকানন্দার জলে ফেলে দিয়ে গেলেন! তখন অষ্টম শতাব্দী চলছে—শঙ্করাচার্যের জীবনের শেষ বছর। শিবদেহে বিলীন হয়ে যাবার আগে তিনি বদরীতে এসেছেন মূর্তি উদ্ধার করে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে। অলকানন্দার আবর্ত থেকে নারায়ণের যে মূর্তি উদ্ধার করে শঙ্করাচার্য বদরী মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই মূর্তি আজ পর্যন্ত পূজো পেয়ে আসছেন। আজও গিয়ে ভক্তরা সেই মূর্তিই দর্শন করছেন।

কেদারনাথের মন্দির থেকে বদরী আসতে আমাদের দু'শ চল্লিশ কিমি (গৌরীকুণ্ডর পর চৌদ্দ মাইলের চড়াই-উৎরাই সহ) পথ

অতিক্রম করতে হয়েছিল। পাণ্ডবদের আগমনকালে কেদার পাহাড় থেকে বদরীর নীলকণ্ঠ পাহাড়ে পৌঁছানো যেত মাত্র পাঁচ মাইলের সোজা পথ পায়ে হেঁটে—একই পুরুতঠাকুর তখন কেদার-বদরীতে যাতায়াত করে রোজ দেবতার পূজো দিতেন। তারপর মানুষের কিংবা পুরুতের অনাচারে নাকি সেই পথ গেল বন্ধ হয়ে। আজ তাই ঘুরপথের ব্যবস্থা। আচার-বিচারের কথা ভগবান জানেন—মনে হয় নীলকণ্ঠ পাহাড়টি প্রাকৃতিক কারণেই মাথা তুলে দিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। পাঁচ মাইলের বদলে দু'শ মাইলের দুর্গম পথ এখন আমাদের পাড়ি দিতে হচ্ছে!

বদরীর প্রায় পনেরো কিলোমিটার আগে যোশীমঠ—তার অল্পদূরে বিষ্ণুপ্রয়াগ। কলিযুগের শেষে বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটবর্তী জয়-বিজয় পাহাড় নাকি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে; স্বভাবতই তখন বদরীর পথ যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। কিন্তু সে তো লক্ষ যুগ পরের কথা! তবে বদরীনাথজী তখনও নাকি নিয়মিত পূজো পাবেন। ভবিষ্য-বদরীতে। বিষ্ণুপ্রয়াগের অদূরে। দেবতার পুনর্বাসনের জন্য ভাবতে হয় না!

আপন সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে ভন মুলার যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার-বদরী—একের পর একটি হিন্দুতীর্থ দর্শন করে চলেছে, ঘোড়া-ডাণ্ডী-কাণ্ডি বর্জন করে, কষ্টের পায়ে চড়াই-উৎরাই হেঁটে। ক্যাথলিক খৃস্টান পরিবারে জন্ম হলেও মুলাররা আপন ধর্মের অনুশাসন তেমন কিছুই মেনে চলে না, গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনাও করে না। হিন্দু-ধর্মই ভন মুলারের মন বিশেষ করে টানে - হিন্দুধর্মের প্রেম, ঔদার্য, সহিষ্ণুতার উচ্চ আদর্শ পৃথিবীর আর কোথাও নেই বলে ভন মুলার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। 'হিন্দুর পরধর্মসহিষ্ণুতার তুলনা নেই,' ভন মুলার বলে—'এমন কি যারা তাকে নির্যাতিত করে, তাদের প্রতিও হিন্দু ক্ষমাশীল।'

আমি আরও দুটি ধর্ম এবং ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে ওর মতামত চাইলে ভন মুলার অন্তত একটি ধর্ম নিয়ে বেশ বক্রোক্তি করে—'বড়ই বাক্-

সর্বস্ব এবং উপদেশগর্ভ, কাজে-কথায় অমিল, ভন মুলার জানায়—'হিন্দুধর্মের প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিক গভীরতা, প্রেম, ত্যাগ, মহৎ বৈরাগ্য কোথায় ঐ ধর্মে ?'

'ইউরোপের ভিন্ন পরিবেশ থেকে এসে ভারতময় ঘুরে বেড়াও,' ভন মুলার আরও বলে—'চোখে পড়ে শুধু দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। এবং তার শত বিকৃত রূপ। এ সব দেখে ঘৃণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আমি কিন্তু এর অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছি—এই দরিদ্র লোকের হৃদয় কত সরল, কত অকপট। এই সারল্য যে সবাইকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।'

ভন মুলার এবার আপন বক্তব্য কিছু সংশোধন করে বলে—'তাই বলে কিন্তু গরিব হওয়া, গরিব থাকা আমার আদর্শ নয়—দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। হিমালয়ের গরিব আর সমতলের গরিবেও অবশ্য অনেক ফারাক—সমতলের দারিদ্র্যে সরলতার বদলে নিচতা প্রকট থাকে।'

'তোমাদের রেলে, তোমাদের পোশাকে, খাওয়ায়, থাকায়, তোমাদের সব কিছুতে চরম দারিদ্র্য আমার চোখে পড়ে,' ভন মুলার ফের মন্তব্য করে—'কিন্তু আমি পরোয়া করি না। আমি শুধু খুঁজে বেড়াই ভারত-আত্মার মর্মবাণী। আই কেয়ার, আই ওয়াণ্ট টু কেয়ার —মোর এণ্ড মোর এণ্ড মোর ফর দিস !'

রোজা আমাদের ইংরেজী কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে, কিন্তু এক বর্ণও বোঝে না—সারাক্ষণ শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসে। পথ-চলতি আলোচনায় যোগ দেবার এ হচ্ছে এক কৌতুককর কায়দা !

অনেকেই বলেছিল বটে—'ব্যাসগুম্ফা ? তিন কিলোমিটারের বেশি হতেই পারে না। ভীমপুল তো তার খুবই কাছে।' বদরী মন্দির থেকে এগিয়ে মিলিটারি সড়ক ধরে অলকানন্দার তীর-বরাবর সাত কিমি হেঁটেছি। কোথায় ভীমপুল, আর কোথায় ব্যাসগুম্ফা ! লাভের মধ্যে এই অলকানন্দা আর সরস্বতীর সঙ্গম দেখতে পাচ্ছি।

জ্ঞানের নাড়ী টনটনে—এই কথা শুনেই আমরা ভাবতে বসি, দেশে আমাদের লোক বেড়েই চলেছে। ভবিষ্যতে কোন সরকারের পক্ষেই হয়তো খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না—ঐ সব শেকড়-বাকরের সন্ধান এখনই যদি আমরা পেয়ে যাই! সে থাক গে, মুনি-ঋষিদের খিদে মেটাবার জন্য হিমালয়ে আরও অনেক কিছু ছিল; চমড়ী গাইয়ের বাঁট থেকে দুধ ঝরে বরফের উপর পড়ে জমে থাকত। মুনিপ্রবররা তাও খেতেন। একদিন খেলেন তো ব্যস, দিন কয়েকের মতো নিশ্চিন্তি।

এই সব আলোচনা যখন জোর চলছে, আগন্তুক দলের একটি বাচ্চা ছেলে ব্যাসদেবের বাসগৃহের একটি সমস্যার দিকে আঙুল রেখে বলল—ওমা দ্যাখো, ঘরের জানালা কত ছোট! বড় ঘরের ছেলে—বাড়িতে ঘরের সাইজ অনুপাতে ওদের জানালা তৈরী। কিন্তু এখানকার বরফের রাজ্যে বড় জানালা যে সুবিধার নয়, নিজে তা বুঝতে হলে ওর আরও কিছু বয়স হওয়া দরকার।

মুনিঋষিদের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। ভুললে চলবে না, তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিপুরুষ, যোগবলে বলীয়ান। সুতরাং ক্ষুধাতৃষ্ণা তাঁদের কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না।

ব্যাসদেবের রচনা নিয়েও কিছু কিছু প্রশ্ন উঠেছে—একজন লোকের পক্ষে এমন ঢাউস ঢাউস এত বই লেখা কি সম্ভব? ব্যাস-ভক্তরা সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর এগিয়ে দিয়েছেন, তারা বলেছেন—'ব্যাসদেব তো শুধু ডিক্টেশন দিতেন; বড় হাতে বড় কলম ধরে ঢাবলা ঢাবলা অক্ষরে লিখে যেতেন তাঁর স্টেনোগ্রাফার গণেশ ঠাকুর!'

সেই সব শ্রুত এবং দ্রুতলিপিতে লেখা বেদবেদান্তের কোন পাণ্ডুলিপি নেই। তবু একথা ঠিক, এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পৃথিবীতে যথাযথ বিদ্যমান আছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে ওগুলো নাকি শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখেই ফিরত। বুদ্ধিমান আমরা এই যুগে দিব্যি সব ছাপিয়ে নিয়েছি।

তবু আবার দুটি বিতর্কিত প্রশ্ন ওঠে—শিষ্যপরম্পরায় রচনাগুলো

মুখে মুখেই যদি ফেরে, তাহলে গণেশ ঠাকুরের স্টেনোগিরি করার সুযোগ কোথায়? অর্থাৎ গণেশ দ্রুতলিপিতে ওসব লেখেননি, শিষ্যপরম্পরাতেই আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে।

দ্বিতীয়ত, মহাভারতের মতো বহু অধ্যায়-সমন্বিত গ্রন্থ কিংবা চারি বেদের শ্লোকের পর শ্লোক শিষ্যের পক্ষে অনুচ্ছেদের ক্রম-অনুসারে কি করে মনে রাখা সম্ভব এবং তাঁদের কাছে শুনে নিয়ে কবে লিপিবদ্ধ হল? উত্তর হয়তো অনেক আছে; কতটা গ্রাহ্য ভাববার বিষয়।

অনেক পণ্ডিত নাকি আবার মত প্রকাশ করেছেন, মহামতি বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষ হলেও শেষ পর্যন্ত 'ব্যাস' পদবীতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম ব্যাসের পর আরও ব্যাস অর্থাৎ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ব্যাসেরা এই সব শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যাসবংশ আজ গেল কোথায়? কালের কপোলতলে নিশ্চয় লুপ্ত হয়ে গেছেন। সম্রাট অশোক, হর্ষবর্ধন, কিংবা মহাকবি বাল্মীকি কিংবা কালিদাসের বংশধররা আজ কি আর কেউ জীবিত আছেন! আজ যদি থানেশ্বর গাঁয়ের কোন লোক কলকাতায় এসে হঠাৎ দাবি তুলে বলে—আমি হর্ষবর্ধনের প্রপৌত্র, তস্য প্রপৌত্র, তস্য প্রপৌত্র, তস্য প্রপৌত্রের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের ছেলে, আপনারা কি তখন তাকে স্বাগত জানিয়ে বলবেন—মহারাজের জয় হোক!

এবার আমরা ভীমপুলেব কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ভীমপুলই বটে—একটি মাত্র প্রস্তর খণ্ড, সর্বসাকুল্যে কুড়ি বাই পনেরো ফুট না হয়েই যায় না; ওজনও কম নয়, হাজারখানেক মন তো বটেই—অপ্রশস্ত নদীর উপর পড়ে আছে। তার উপর দিয়ে সবাই এপার-ওপার করছে। পুল পেরিয়ে ওপারে চলুন—এধার-ওধার-সেধারে শুধু পাহাড় আর পাহাড় ঘিরে স্থানটিকে প্রায় গোলীয় আকৃতি দিয়েছে। বাঁয়ে সরস্বতী নদীর খর জলস্রোত গর্জনের রোলে বেরিয়ে আসছে ক্রম-ঢাল বরফের চালের নিচ দিয়ে; তারপর পাহাড়ের গাত্র ঘর্ষণ করতে করতে হালকা সবুজ জল ভীমপুলের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। মানস সরোবরের উৎস থেকে উঠে এসে পাতাল পথে

দের কি একই সমস্যায় পড়তে হল না ? অর্জুন কিন্তু অনেক সহজে কাজ হাসিল করলেন।'

অনেক উদাহরণ বর্তমান যুগেও তো রয়েছে। রাণা প্রতাপ ভারি ভারি যে সব বর্ম পরতেন, দুরন্ত ভারি বর্শা হাতে নিক্ষেপ করে শত্রু ঘায়েল করতেন, আজ কয়জন তা হাতে তুলে দেখতে সক্ষম হবে— যুদ্ধ করার কথা ছেড়েই দিন !

আসল কথা হচ্ছে বিশ্বাস। প্রায় তেরো শ' বছর আগে শঙ্করাচার্য বদরীতে এসেছিলেন, আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে জন্ম নিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ এই মাটির পৃথিবীতে দুষ্কৃতকারীদের নিধন, সাধুদের পরিত্রাণ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের আমরা দেখিনি, তবু বিশ্বাস করি। শঙ্কর বুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস হলে কৃষ্ণের অস্তিত্বেও অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস না করলে মহাভারত থাকে না, কুরুক্ষেত্র থাকে না, যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব কেউই থাকেন না। সুতরাং রামের হরধনুর মতো ভীমের প্রস্তর-সেতু রচনায় অবিশ্বাস করার হেতু কোথায়! হয়তো বাকি চার ভাই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন, এই মাত্র! ভীমপুলের পাথর নিঃসন্দেহে ভীমের হাতে তোলা। এবং ফেলা !

সমস্ত তর্কাতর্কির অবসান ঘটাতে স্বামী পুরুষোত্তম স্বরূপ শেষ পর্যন্ত বললেন—আই শুড টেক ইট অ্যাজ ইট ইজ অর্থাৎ যেমনটি আছে, আমি তেমনি মেনে নিতে প্রস্তুত !

ভীমপুল থেকে ফিরে খেতে এসেছি সুপ্রিয়া হোটেলে। কানে আসছে মিহিসুরের ভজন গান। মাসীর কাছে বসে গাইছিলেন পাপিয়া দাস, কলকাতার এম-এ পড়া মেয়ে—হিমালয়ের ডাক কানে যেতেই বদরিকাশ্রমে এসে বসে আছেন। মাস দুয়েক থাকতে। অপর মহিলাই হোটেলের মালিক। এবং বালানন্দ আশ্রমের গুরু-

ভ্রাতা, গুরু-ভগ্নীপরম্পরায় তিনি পাপিয়ার মাসী। আত্মিক যোগ আছে বলে আত্মীয়া।

হোটেলের খানা নিরামিষ—ডাল, আলুভাজা, আলুকপির ডালনা কিংবা আলু-টম্যাটোর ঝোল। হরিদ্বার হোটেলের মতো বাসমতির ভাত, দুটো তরকারি, এক চামচ ঘি এখানে কোথাও মেলে না। সরষের তেলে রান্না বলে এখানে ভিড় বেশি বাঙ্গালিদের। অন্য হোটেলেও সরষের তেল ব্যবহারের বিজ্ঞাপন অবশ্য টাঙানো থাকে। হোটেলে ঢুকে একমাত্র বাঙ্গালিই জিজ্ঞেস করে—কি তেলে রেঁধেছ? সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে—সরষের তেলে। তারপর সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ওরা বলে—আসুন বাঙ্গালিবাবু, খেয়ে যান। আগন্তুক যে বাঙ্গালি ওরা ভালই জানে।

উত্তরপ্রদেশের অনেক জায়গার মত গাড়োয়াল মণ্ডল জুড়ে সরষে মোটামুটি ভালই জন্মে, সরষের তেলের ব্যবহারও আছে, তবে দালদাও খুব চলে। হিমালয় অঞ্চলে দালদার রান্না খেলে আমার কেবলই কলকাতার এক পাঞ্জাবী হোটেলের কথা মনে পড়ত। একটি বড় কড়াতে সদ্ধ ডাল সব সময়েই সেখানে তৈরী থাকে। ফ্রায়েড ডাল হুকুম করলে সসপ্যানে একটু দালদা ঢেলে তাতে লঙ্কা হলুদের গুড়োয় পেঁয়াজ রসুন কষিয়ে খানিক সেদ্ধ ডাল ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর প্লেটে তুলে ধনেপাতা, দু টুকরো টম্যাটো, এক চামচ কাঁচা দালদা মিলিয়ে এনে সর্দারজী বলে—খা লো বাবুজী, গরম তরকা! হিমালয়ে আর তেমন ডাল কোথায়, রাজমা নয়তো চৌলি ফুটিয়ে ওরা ডাল করে, আমাদের শিমের বীজে ডাল রান্না করার মতো।

বাংলার বাইরে সদ্য আগত বাঙ্গালির আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে—বাইরে গিয়ে সবাই মিষ্টি খোঁজে; রসগোল্লা, সন্দেশ, পানতুয়া, লেডিকিনি, ছানার গজা, রসকদম। এবং অবশ্য জিলিপি। যোশীমঠে প্রায় জোর করে গাড়ি থামিয়ে বাঙ্গালিরা জিলিপি খেয়েছিল—পনেরো টাকা কিলো, দালদায় ভাজা; রসটুপটাপ নয়, কারণ রসে

ডুবিয়েই পাল্লায় চড়িয়ে ওজন হচ্ছিল—কিলোয় ন'শ গ্রাম। তা হোক—জিলিপি বটে তো! না খেলে চলে!

প্রসঙ্গত একটি কথা বোধ হয় ভাবতে পারা যায়—বঙ্গীয় মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লা সর্বভারতে মোটামুটি সবাই খায়। সবাই খেতে ভালবাসে। কলকাতা-প্রবাসী মাদ্রাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, বলতে গেলে সব প্রদেশের লোকই দেশে যেতে কলকাতা থেকে টিনের রসগোল্লা কিনে নিয়ে যায়। প্রিয়জনকে উপহার দেয়। অথচ টাটকা রসগোল্লার মতো তার তেমন স্বাদগন্ধ নেই, খেতেও কিছু আহামরি নয়। অথচ বহির্বাংলায় রসগোল্লা তৈরী হয় খুব কম জায়গায়। যৎসামান্য বোম্বেতে চোখে পড়ে। তীর্থে বাঙ্গালির ভিড় বেশি বলে হরিদ্বারে অবশ্য অঢেল রসগোল্লা তৈরী হয়। আমাদের কিন্তু মনে হয়, হিসেবী বাঙ্গালি এসব একবার খেয়াল করে দেখলে ভারতের শহরে শহরে, বড় বড় গাঁয়ে রসগোল্লা তৈরীর ব্যবসা খুলে বসতে পারে। তাতে লাখখানেক বাঙ্গালির ভাত হতে পারে।

খুব দুঃখের কথা, বদরিকাশ্রমে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কোন কেন্দ্র নেই; অবশ্য একটি শাখা খোলার পরিকল্পনা নাকি করা হয়েছে। বালানন্দ আশ্রম বাদে বদরীতে আরও খুব বড় একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান আছে, নাম তার পরমার্থ লোক। আদি প্রতিষ্ঠাতা একসরানন্দজী। শ্রীমদভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাব্বিশটি দেবী সম্পত্তির কথা বলেছেন, যেমন—ভয় শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞান অর্জনের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাশূন্যতা, সর্বভূতে দয়া, লোভ শূন্যতা, অহঙ্কারাহিত্য, কুকর্মে লজ্জা, চাপল্য শূন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যান্তরশুদ্ধি, হিংসারাহিত্য এবং নিজেকে অতিপূজ্য ভেবে নেবার অভিমানের অভাব।—বাস্তব জীবনে এসবের প্রয়োগ এবং প্রচার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে পরমার্থ লোকের উদ্দেশ্য। এই সংঘের বাইশটি শাখা, দুটি হাসপাতাল, বেনারস সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চারটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।—ঋষিকেশ,

ম্যানপুরী, শাজাহানপুর, রায়পুর জেলার রাজিমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণ-ব্যবস্থা একেবারে প্রাইমারী স্তর থেকে। খাওয়া থাকা ফ্রি।

'পরমার্থ লোকে কোন রাজনীতি আলোচনার অবকাশ নেই', সৌম্যদর্শন প্রলম্বিত-শ্মশ্রু এক স্বামীজী বললেন—'হিংসা, দ্বেষ, বিসংবাদের উর্ধ্বে বসে সবাইকে সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত রাখাই হচ্ছে আমাদের আসল কাজ।' সন্দেহ নেই মহৎ কাজ।

বদরীধামে একজন আধুনিক সাধুর সঙ্গেও আমার কথা হল। তাঁর বয়স সাতাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী আছে, দাড়ি এবং জটাজুটের গৌরব নেই। সাধুজীর পূর্বনাম পর্যন্ত কেউ জানে না। তাঁর আশ্রমপূর্ব জীবনের কোন কথা তাঁর কাছে শোনার কোন উপায় নেই। 'গঙ্গা যেখানে প্রবাহিতা, সেখানেই তার প্রয়োজন এবং মাহাত্ম্য বড় করে ধরা পড়ে। সাধুর মূল্য ধরা পড়ে যেখানে তিনি থাকেন।' আমার কৌতূহল দমিত করে দিয়ে সাধুজী বললেন—'আমি আর যা হই, বাঙ্গালি নই। আমার ব্যক্তিগত অন্য কথায় কি দরকার।'

দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হলেও এই স্বামীজী গজদন্তমিনারবাসী নন, বরং প্রায় পৃথিবীর সমতলে বাস করেন—কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তাঁর নেই বলেই তিনি মনে করেন। 'স্বাধীন ভারতের স্রষ্টারা ছিলেন পরম আদর্শবাদী, গোড়াতেই ভারতকে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু', স্বামীজী এবার একটু দম নিয়ে বললেন—'যে ৯৭% সংখ্যালঘু পাকিস্তান চেয়ে এবং পেয়েও ভারত ছাড়েননি, তাদের বেশির ভাগ এখন ভারত-বিরোধী—আবার তারা দেশবিভাগের স্বপ্ন দেখে।'

'পাঞ্জাবে চোখ ফেরাও—অপর এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক ভারত ভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র করে নিতে চাইছে—শুধু আপন সম্প্রদায়ের লোকের জন্য।'

'আর তোমাদের কলকাতাতেই বা কি না হচ্ছে', আমাকে প্রায়

ধমক দিয়েই সাধুজী বললেন—'আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে ওখানে বসে এক মহিলা মানবসেবা করছেন—সবাইকে আপন ধর্মে প্রথমে দীক্ষা দিয়ে। জাতিধর্মনির্বিশেষ মানবের সেবা নয়!'

'তা হলে ব্যাপারখানা কি এই দাঁড়াচ্ছে না', বোধহয় শেষ মন্তব্য করতেই যুবক স্বামীজী বললেন—'ভারতের সংখ্যালঘুরা শুধু আপন আপন সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি, দলবৃদ্ধি, স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত—আর যতো দায়দায়িত্ব সব ভারত সরকারের; ভারত সরকার সবার সব সুবিধা করে দেবেন, কারণ সেকুলার মন্ত্রে ভারত স্বদীক্ষিত। সুতরাং ভেবে ছাখো, গাছের খেয়ে তলার কুড়িয়েও সংখ্যালঘুরা কি বিপদ ডেকে আনছে। ভারতের এবং নিজেদেরও।'

'কিন্তু স্বামীজী', আমি বলতে চেষ্টা করি—'এ সব তো রাজনীতির কথা। আপনি সন্ন্যাসী মানুষ—আপনার স্থান তো এসব কিছুর ঊর্ধ্বে।'

'সন্ন্যাসী বলেই তো ভাবনাটা আমাদের বেশি', আমাকে জ্ঞান দেবার মতো করে স্বামীজী এবার বললেন—'সংখ্যালঘুদের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত খোদ হিন্দুস্থানে সন্ন্যাসীদের টিকে থাকবার কোন উপায় আছে বলতে পার?'

স্বামীজী আগেই আমার জীবনবৃত্তান্ত জেনে নিয়েছিলেন। ওপার বাংলার লোক বলে বোধহয় আমাকে ঠেস দিতেই এবার তিনি বললেন—'তোমাদের অনুকূল ঠাকুর, মা আনন্দময়ী, বালক ব্রহ্মচারীদের খবর আমি রাখি। তাঁরা কি মনে করতেন, অথবা তুমি নিজেই কি এখন চিন্তা করতে পার, পূর্ব বাংলায় বসে থাকলে তাঁরা খুব নিরাপদে ঈশ্বরচিন্তা কিংবা মানব-সেবা করতে পারতেন? পারতেন না বলেই তাঁরা ভারতে এসে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলেন। ব্যাপার কি জান?' প্রশ্ন করে স্বামীজী এবার নিজেই জবাব দিলেন—'তাঁরা ইতিহাস পাঠ করেছিলেন। ধর্ম বিপন্ন বলে যারা সুযোগ মতো জিগির তোলে, তারা যে অপর ধর্ম কখনও সহ্য করে না অনুকূল ঠাকুররা তা জানতেন।'

মজার কথা, আমার সঙ্গে ছিল ভন মুলার আর রোজা। তারা প্রায় নীরব শ্রোতাই ছিল, মুলার মাঝে মাঝে অবশ্য স্বামীজীর কথার 'নোট' নিচ্ছিল। এবার বোধহয় সুযোগ পেয়েই খপ করে একটি প্রশ্ন করে বসল—'ধর্মের জিগির কেন তুলবে না বলুন', ভন মুলার সাধুকে মোক্ষম ঘায়েল করতেই বলল—'আপনাদের দেশে তো অনেক রায়ট হয়! এমন করে রায়ট হলে অপর ধর্মের কোন লোক নিরাপদ বোধ করতে পারে?'

স্বামীজী এবার মিট মিট করে একটু হাসলেন, তারপর বলতে লাগলেন—'জীবন-তৎপরতার তিনটি করে মানে থাকে, যেমন প্রথমত—আধিভৌতিক অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের সাধনা। দ্বিতীয়ত—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের পক্ষে যাকে বলা চলে দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয়ত—আধ্যাত্মিক; তার লক্ষ্য নিশ্চয় ব্যাখ্যা করতে হবে না। এর যে কোন স্তরে বাধা পেলেই সবাই বিহ্বল হয়, আপন ধর্মমতে এগিয়ে চলতে সাহস হারায়। কিন্তু', স্বামীজী এবার আমাকে এবং মুলারকে বেশ করে লক্ষ্য করে নিয়ে বলেন—'ইণ্ডিয়ায় রায়টের রহস্য কোথায় জান? সংখ্যালঘুরাই এখানে রায়ট লাগায়। ধর্মস্থানে অস্ত্র জমা করে রাখে, বিদেশী বেরাদরদের স্বার্থের কথা ভেবে প্রচার—'

প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে ভন মুলার বলে—'সংখ্যালঘুরাই যে রায়ট লাগায় তার প্রমাণ?'

'প্রমাণ!' স্বামীজী খুব ধীরস্থির এবং শান্তভাবে যেন বহু পরীক্ষিত একটি সত্য উদ্‌ঘাটন করছেন তেমন করে বলেন—'প্রমাণ তো অনেক আছে, তবে সব চাইতে বাহ্যপ্রমাণটি বিবেচনা করে দেখতে পার—বেছে বেছে মোরাদাবাদ, মুজাফ্‌ফরনগর, আলীগড়ে রায়ট লাগে কেন? কারণ সংখ্যালঘুরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তুমিই বল', এবার আমাকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেন—'তোমাদের নদীয়ায় রায়ট হয়, বর্ধমানে কেন নয়? পার্ক সার্কাস, মেটেবুরুজ, খিদিরপুর, সাম্প্রদায়িকতায় টগবগ করে—শ্যামবাজার কেন নয়? জবাব দাও?'

আমার জবাব দেবার প্রশ্নই আসে না, কারণ পবিত্র ভারতের মাটিতে আমি সংখ্যালঘু নই। স্বামীজী এবার বলেন—'জানলে ভন মুলার, এখানে সংখ্যালঘুরা অস্ত্র রাখে, সংখ্যাগুরুদের ঘরে আগুন লাগায়, গলা কাটে। মন্ত্রী, লাটসাহেব, রাষ্ট্রদূত হয়, পুলিশের আই-জি হয়ে ছড়ি ঘুরায়। একটু বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে গিয়ে দেখে এসো—সেখানে সংখ্যালঘুরা রায়ট করবে !! বলির পাঁঠার মতো সব সময় কাঁপে !!

ভন মুলার যথারীতি সব কথার নোট নিতে ভুল করে না। ভারত ভ্রমণ-কাহিনী সে লিখবে বলেই মনস্থির করেছে। পরে অবশ্য ভন মুলার আমাকে জানিয়েছে, শুধু স্বামীজী বলেই তাঁর সব কথা সে মেনে নেবে না—সে মোরাদাবাদ, মুজাফ্ফরনগর, আলীগড়ে যাবে, এমন কি মেটিয়াবুরুজ, পার্ক সার্কাসও ঘুরে দেখবে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে গিয়ে সব কথার যাচাই করবে। মনে হয় ওর সিদ্ধান্ত খুবই নির্ভুল। ওর হাতে সময় আছে—তাই মথুরা সোমনাথেও যাবার মতলব আছে। মথুরায় সুলতান মামুদ যে দশ হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিল, পঞ্চাশ হাজার লোক মেরে মন্দির ভেঙে সোমনাথ থেকে যে দু'শ মন সোনা লুটে নিয়েছিল, ইতিহাসে ভন মুলার তা পড়েছে বটে, তবু নাকি জায়গাগুলো দেখার দরকার আছে।

বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে। সাধুর কাছে বিদায় নিয়ে ভন মুলারকে বললাম—চল, এবার ঋষিকেশ ফেরার বাস কখন ছাড়বে খোঁজ নেওয়া যাক।

বদরীনাথ থেকে পাণ্ডুকেশ্বর, যোশীমঠ, চামৌলি হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ—সেখান থেকে সোজা চলে এলাম দেবপ্রয়াগে। পাণ্ডুকেশ্বরে পাণ্ডুরাজা নাকি তপস্যা করেছিলেন, দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবও এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের পর রাজ্যপাট ফিরে পেলেও পাণ্ডবদের মনে শান্তি ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেই তাঁরা হিমালয়ের পথে

পথে ঘুরে ফিরছিলেন—মনে শান্তি লাভ করতে। একথা বারান্তরেও আমরা উল্লেখ করেছি। হিমালয়ে এসেই শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ-প্রাপ্তি, বাকি সবার ৺প্রাপ্তি ঘটেছিল।

হিমালয় থেকে সশরীরে স্বর্গে যেতে পারব সেই সম্ভাবনা আমাদের ছিল না, তেমন পুণ্যি তো নয়ই। মনের শান্তি কতটা পেয়েছিলাম তার হিসেব কষা তখন সম্ভব ছিল না—প্রতিমুহূর্তের ব্যস্ততার মাঝে শরীরগত মনোগত ব্যক্তিগত অনেক কিছুই তখন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। হিমালয়ে আমাদের শুধু একটি লক্ষ্যই ছিল—এগিয়ে চলার লক্ষ্য।

এবার ফেরার পালা—দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে যেতে গঙ্গা-অলকানন্দার সঙ্গম আবার চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আশপাশের জড়প্রকৃতি এবার যেমন করে চোখে ধরা দিচ্ছে আগে তেমনটি যেন দেয়নি। পাহাড় পর্বত এদিকে প্রচণ্ড খাড়া, অনেক গাছপালা নিষ্পত্র; নদীর জল কর্দমাবিল। ন্যাড়া-মাথা একটা গাছের ডালে বসে একলা হনু ডিনার খাচ্ছিল; তার বনফলের সান্ধ্য ভোজ। ক্যামেরা তাক করতেই হতশ্রী হনুমান ভেংচি কেটে দে-ছুট। ডালে ডালে অন্য হনুদের মাঝেও কিছু চাঞ্চল্য জেগে উঠল; পোড়ামুখে তারাও ভেংচি কাটতে লাগল।

এ পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই হনুমান আমাদের ভেংচি কেটেছে, বাসের ভিড় অস্থির করেছে। কিন্তু হরিদ্বারে ভোলাগিরি ধরমশালায় হনুমানের হাতে আমরা বড় হতমান হয়েছিলাম। বোধহয় দীর্ঘদিন ওখানে বসবাস করে সাহস ওদের বেজায় বেড়েছে। তাই শুধু যাকে তাকে ভেংচি কাটাই নয়, বেশ ভালরকম হাতটানও ওদের আছে—সুযোগ পেলেই ধরমশালাবাসীদের এটা ওটা সরিয়ে নিয়ে নিজের মতো করে কাজে লাগায়। একদিন তো এক বুড়ো হনু দীপক কুমারের আরশিটা হাতে তুলে নিয়েই হাওয়া—তপনকুমার তাড়া করতেই তাকে সেকি বিশ্রী ভেংচি কাটার ছিরি! পরদিন পাশের ঘরের একটি ছেলে বললে—'আরশিটা ফেরত পাননি ?'

করলেই যদি', আরও কিছু দুর্নীতির উদাহরণ দিতেই বোধহয় রেলকর্মী বললেন—'কেটারিং-এর লোক জি-এম্-এর বাড়িতে তিন কিলো ছানা, পাঁচ কিলো মাটন, ছ কিলো ঘি মুফতে পাঠিয়ে দেয়, সে দেশের রেলে কখনও উন্নতি হয় ?'

এই ভদ্রলোকের এত রাগের কারণ, কলকাতা ফিরে যাবার রিটার্ন পাশ পাননি, রেলের লোক বলে স্থানীয় কর্মীরা তার উপর প্রথমে বিরক্ত হয়েছিলেন কারণ একটা রিজার্ভেশন তাকে মুফত দিতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে হরিদ্বার থেকে দেরাদুন যেতে হয়, রিজার্ভেশনও তিনি পান, তবে মাথা-পিছু পঁচিশ টাকা খরচা করতে হয় !

আমি ভাবছিলাম অন্য কথাঃ জি-এম হলে আমি কি কেটারিং-এর কাছ থেকে ঘি, মাংস, ছানা নিতাম, টিকেট কাটার চেয়ারে বসলে কি লোকের গাঁট কাটতাম ? বেশ টের পেলাম, জবাব দিতে মনটা বড়ই ইতস্তত করছে !

আমাদের কামরায় ভগবতীপ্রসাদ নামে এক উত্তরপ্রদেশী লোক ছিলেন। রেলের কেউ না হলেও রেলের 'পরে ভগবতীপ্রসাদের সমর্থন কিন্তু কম নয়। গাড়ি হঠাৎ-হঠাৎ যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্বন্ধে ভগবতীপ্রসাদ বললেন—ইয়ে তো কই খাস গাড়ি নেই হ্যায়, টিশান ভি ছোটা হ্যায় !

যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী—এই চারো ধাম সেরে হরিদ্বারে নাকি ফিরতে হয় ; ফেরার রীতি আছে—নইলে তীর্থের পুণ্যি নাকি পুরো হয় না। হরিদ্বারে না ফিরে আমাদের অবশ্য উপায় ছিল না, সুতরাং পুণ্যি ফুণ্যি কা কথা—হাওড়া ফেরার গাড়ি হরিদ্বার থেকেই ধরতে হবে। ভাগ্যিস রিটার্ন টিকেট করা ছিল, নইলে আর উপায় ছিল না। টিকেট কাউন্টারে লোক কেমন হন্যে হয়ে ঘুরছে। ন্যায্য পয়সা বাড়িয়ে দিলে টিকেট মেলে না—কি জঙ্গুলে কারবার !

ভগবতীপ্রসাদ মুজাফ্ফরনগরে বাস করলেও অযোধ্যার লোক।

'পিরথিমীতে অযোধ্যার চেয়ে বড় তেত্ব কি আর আছে বাবুজী?' হঠাৎ ভগবতীপ্রসাদের মন্তব্য শোনা যায়।

'তা হলে চারো ধাম সেরে নিতে তুমি ব্যস্ত হয়ে এসেছ কেন?'

'এসেছি তাই কি', ভগবতীপ্রসাদ জবাব দেয়—'আমি ঠিক জানি, সব ধামন সে ধাম বড়ী হ্যায় অযোধ্যাপুরী সুখ ধাম!'

ভগবতীপ্রসাদের ভক্তিবিশ্বাস নিয়ে তর্ক করা চলে না। তার মত অনুসারে তীর্থের মর্যাদায় হরিদ্বার-হৃষিকেশ দ্বিতীয় শ্রেণীর। কেদার-বদরী অনেক উপরে—অযোধ্যা একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রথম।

'দূর দূর, কি আছে হরিদ্বারে', আমাদের বেহালার এক ছোকরা পর্যন্ত বড় গলায় বলে দেয়—'একমাত্র গঙ্গার ধার ছাড়া সবই তো মাছি। আর গরু।'

'মাছ খেতে পাওয়া যায় না, রাতে পাহাড় দেখা যায় না', ওর বড় বোনও মন্তব্য করে—'এটা কি একটা শহর হল!'

'তবে হ্যাঁ', মেয়েটি এবার অজ্ঞাতে কবির চোখে হরিদ্বার-দেখা বর্ণনা করে—'রাতের বেলায় আমার ভাল লাগে। ওপার পাহাড়ের মাথায় ঘরবাড়ির আলো দেখলে মনে হয়, আকাশের গায়ে লেগে থেকে আলোগুলো জ্বলছে।'

অবশ্য অন্য অনেক তীর্থের মতো হরিদ্বারও পাপের পুরী—ঠগ, ঠেটা, গুণ্ডা, বদমাস নিকটেই আছে। নিজেকে এখানে দেখে চলতে হয়, নিজের মালের উপর নজর রাখতে হয়। তবু হরিদ্বার কিন্তু হরির দ্বার—হিমালয় জুড়ে এই যে এত বিস্তীর্ণ দেবভূমি, এত সব পুণ্যতীর্থের আকর্ষণ এত দুর্গম পথবিস্তার, তার সব কিছুর আঁচ পাওয়া যায় হরিদ্বারে—এখানে হিমালয়ের শুরু, তীর্থের শুরু, হিমালয় জোড়া দেবস্থানের প্রথম দ্বার। তাই তো সবাই বলে হরিদ্বার। হিমালয়ে সর্বতীর্থ সেরে তাই তো আবার ফিরে আসতে হয় হরিদ্বারে। এই খানে হরির দ্বার ঠেলে সবাই ঢুকে পড়েছিল, এবার সে দ্বার দিয়ে বের হয়ে ঘরে ফিরে যাও। হিসেবে গড়মিল কোথায়!

হরিদ্বারের মাইল দুয়েক দূরে কনখলেরই কি আর কম নাম-ডাক? স্বয়ং দক্ষরাজার বাড়ি ওখানে; সেই গৌরীকুণ্ডে শিবের জন্য তপস্যা-করা সতীর বাপের বাড়ি। দক্ষরাজাও যে-সে নন, স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র। তাঁরই রাজধানী ছিল কনখলে। মুনিঋষিরা মিলে একবার প্রয়াগতীর্থে খুব ভারি ধরনের এক যজ্ঞ করলেন। সতীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং শিবও নেমন্তন্ন রক্ষা করতে প্রয়াগে গিয়েছিলেন; সকলেই তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন। একটু পরেই যজ্ঞস্থলে এসে হাজির হন দক্ষরাজা। তাঁর সম্মানে সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেও শিব নিজের আসনে বসে থাকেন। শ্বশুর মশায়ের মনে ভারি রাগ হয়—জামাই-শ্বশুরে সেই থেকে চলে মনকষাকষি।

পরের ঘটনা দক্ষযজ্ঞ। জামাই-মেয়ে শিব-পার্বতীর তাতে নেমন্তন্ন মিলল না। নিমন্ত্রিত মুনিঋষিরা তখন কনখলের যজ্ঞস্থলে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের কাছেই সতী শুনতে পেলেন, তাঁর বাবার আয়োজিত যজ্ঞের কথা। বাপের বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে মেয়ের যেতে দোষ নেই—এই অজুহাতে শিবের অনুমতি নিয়েই সতী গেলেন কনখলের বাপের বাড়িতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কেউ কথাই বললেন না। শুধু কি তাই? নির্দিষ্ট আসনে সেখানে দেবতারা বসেছিলেন—অথচ শিবের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন সতী দেখতে পেলেন না। পতির অপমানে রাগে, দুঃখে, অভিমানে সতী দেহত্যাগ করলেন। খবর পেয়ে চলে এলেন শিবঠাকুর। তাঁর চেলারা লণ্ডভণ্ড কারবার শুরু করে দিলেন। শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ভারতের পথে পথে এবার পাগলের মতো তাণ্ডব শুরু করলেন। দেবতারা প্রমাদ গুণলেন—ইন্দ্রের চক্রে খণ্ডিত সতীদেহ পড়ে পড়ে সারা ভারতে গড়ে উঠল একান্নটি তীর্থস্থান। বাংলার সৌভাগ্য, সতীর কড়ে আঙুল নাকি পড়েছিল কালীঘাটে!

পুরাণকাহিনী বাদ দিলেও কনখলের নামের মধ্যে কেমন যেন একটু মাহাত্ম্য আছে। আমার তো মনে হয়, কনখল বড় কবিত্বময় নাম, মনে ব্যথা জন্মানো, বৈরাগ্য জাগানো নাম। এখানে এসে

দক্ষযজ্ঞের স্থান দেখুন, মা আনন্দময়ীর আশ্রম দেখুন—চারদিকের সমস্ত আধুনিক সৌধাবলীর মধ্যে বসেও মনটা চলে যাবে সুদূর অতীতে, মনে হবে, সতী অভিমানিনী এক বাংলার মেয়ে—বিনা নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ি গেলেও স্বামীর অপমান সইতে নারাজ। স্বামীর জন্য প্রাণটাই শেষে দিয়ে দিলেন !

কনখল থেকে ফেরার পথে শান্তারাম লিঙ্গম্‌কে শুধালাম—'কনখলে কি দেখলে বল তো ?'

শান্তারাম বললে—'এনাকে অণ্ডুম তেরিযাদে, ইংরেজী অনুবাদে যা দাঁড়ায়—আই ডোণ্ট নো। আমি জানি না।'

হাওড়া থেকে হরিদ্বার পনেরো শ' কিমি। ট্রেনে এই পথটুকুতে দীপক-তপনদের সঙ্গ পাবে বলে মাদ্রাজ থেকে আঠারোশ কিমি নিঃসঙ্গ ট্রেনপথ একা পেরিয়ে সে কলকাতায় এসেছে। সবার সঙ্গে সাথে ফিরে চারোধাম দেখে শান্তারাম আবার এসেছে হরিদ্বারে। মনে হচ্ছে, মহিষ-রূপী শিবের কথা, বদরীনাথের মাহাত্ম্য, হরিদ্বারের সপ্তঋষি আশ্রম-রহস্য, এমন কি কনখলে আজকের মা আনন্দময়ীর কথা শান্তারাম কিছুই জানে না ; কাউকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি—ঘুরতে হয় তাই তীর্থে ঘুরেছে, সঙ্গে সাথে ফিরে চর্মচোখে নদী-পর্বত-মন্দিরাদি দেখেছে। ব্যস ! ঠাকুর রামকৃষ্ণের আমলে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে অনেক লোকই তো বাস করত—তাদের কয়জন ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছিল, কয়জন চিনেছিল তাঁকে ? তাঁর মাহাত্ম্য জেনে এবং মনে মনে বিশ্বাস করে তাঁকে দেখতে গেলে তো সবাই ভক্ত শিষ্য হয়ে পড়ত—গ্রামসুদ্ধ সবাই উদ্ধার পেয়ে যেতো !

এবার ভন মুলারের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে চলেছে। ওরা হরিদ্বার থেকে যাবে দিল্লীতে, তারপর ভারতের আরও কিছু দ্রষ্টব্যস্থান দেখে বাংলাদেশ-পাকিস্থান হয়ে প্লেন ধরবে দেশের পথে—পশ্চিম জার্মানী হয়ে ফিরে যাবে দেশে। অস্ট্রিয়ায়। ওদের চোখেমুখে তীর্থশ্রমের ক্লান্তি নেই—যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী কেদার-বদরী দেখে ওরা পরিতুষ্ট, ঋষিকেশ-হরিদ্বারেও ওদের খারাপ লাগেনি।

কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই ওদের মুখে নেই। বিদায় নেবার আগে আমি বললাম—'তোমার বৌ রোজা ইণ্ডিয়ার তীর্থভ্রমণ নিশ্চয় তোমার মতই উপভোগ করেছে ?'

চট করে ভন মুলার বললে—'রোজা তো আমার বৌ নয় !'

'বৌ নয় ! তবে !'

'আমার গার্ল্ ফ্রেণ্ড। মেয়ে-বন্ধু।'

'মেয়ে-বন্ধু। তবে যে বলেছিলে, আপন গাঁয়ে দুজন এক সঙ্গে বাস করছ, দশবছর দুজনে কাজ করে পান্থশালা চালাচ্ছ।'

'ঠিকই বলেছি—এখনও বলছি।'

'তোমাদের গাঁয়ে কোন কথা ওঠেনি, বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকার জন্য কেউ—'

'না তো !'

আমি চুপ করে যাই। কেদার-বদরীর ধরমশালায় ওরা এক হোটেলে এক বিছানায় থেকেছে। কেউ জানতে পারেনি, ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়—কারও জানার কোন উপলক্ষ্যও ঘটেনি। এসব ঘটনা আমার কাছে নতুন কিছু নয় ; ইউরোপ আমেরিকায় এমন অনেক জুটির মুখোমুখি এসেছি। সেখানে কিছুই আর অস্বাভাবিক ঠেকে নি। তাই বলে ইণ্ডিয়ায়, তাও আবার তীর্থস্থানে ! তবু আমি প্রশ্ন করি—'শেষপর্যন্ত রোজাকেই বিয়ে করবে তো ? নাকি একজন আরেকজনকে ছেড়ে কেটে পড়বে ? কবেই বা আর বিয়ে করবে ?'

'বলতে গেলে বিয়ে তো আমাদের হয়েই আছে', ভন মুলার বলে—'এখন আর কেটে পড়ার প্রশ্ন কোথায়। তবে হ্যাঁ, মন্ত্রপড়া হয়নি, এই যা ! তবু কি দশবছর পর এখন আর ছাড়াছাড়ির কথা ভাবা যায় ?'

নিজের প্রশ্নের জন্য মনে মনে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। মন্ত্রপড়া বিয়ে পঁচিশ বছর ঘর-গেরস্থালীর পরও তো ভেঙে যায়—আমেরিকার ফোর্ড আর কেনেডি পরিবারে পর্যন্ত এসব ঘটে গিয়েছে। তার খবরাখবর রেখে ভন মুলারকে জেরা করার অর্থ, আমাদের সংস্কার

এখনও প্রবল—হৃদয়ের মূল্যের বদলে মন্ত্রের মূল্যকে বড় করে দেখা! আসলে এগুলো সব ব্যক্তিগত রুচির কথা; আমার ছি ছি করার কি যুক্তিই বা আছে! হিমালয়ের গণ্ডগাঁয়ে যুবক বুদ্ধি সিং কি আর তার ভাবী বধূর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না, কিংবা এসব ঘটছে না কলকাতা-কাশী-কাঞ্চিপুরমে? বুদ্ধি সিং আর ভন মুলারের ব্যাপারটি আসলে একই; বুদ্ধি সিং-এর কাজ চলে সবার অলক্ষ্যে, জঙ্গলে—ভন মুলারের পান্থশালায়।—বুক ফুলিয়ে। বুদ্ধি সিং-এর কথা জানাজানি হলে হিমালয়ে হৈচৈ পড়বে। ভন মুলারের গাঁয়ের লোক সব জেনেও চুপ—কারণ বর্তমানে এই ওদের সামাজিক প্রথা। এতে মেয়ের বাপের মাথা কাটা যায় না, পাড়ার দাদারা মারতে আসে না।

ভন মুলার এবার বলল—'মন্ত্রপড়া আমরা কবে সারব জান? যখন বুঝব, এবার আমাদের একটা বাচ্চা চাই!'

আমি করমর্দন করে রোজা আর ভন মুলারকে বিদায় দিয়েছি। বিদায় নিয়েছি। এখন আর ওদের কোন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। আমার গাড়ি এগিয়ে চলছে। ওরা তখনও রুমাল উড়িয়ে হাত নাড়ছে—রোজা আর ভন মুলার। দুজনেই!

সমাপ্ত